

আমাদের নেতাজী

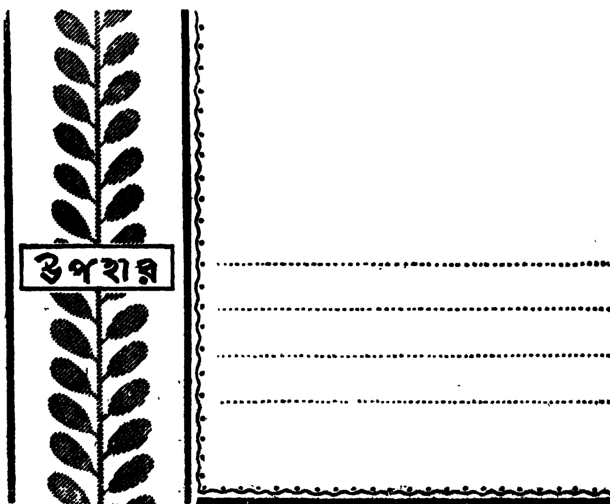
দেব সাহিত্য কুটীর

প্রকাশ করেছেন—
শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার
দেব সাহিত্য-কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড
২১, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা—৯

এপ্রিল
১৯৬০
৪

ছেপেছেন—
এস. সি. মজুমদার
দেব-প্রেস
২৪, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা—৯

শ্রী
র
বি
দা
স
সা
হা
রা
য়


উপহার

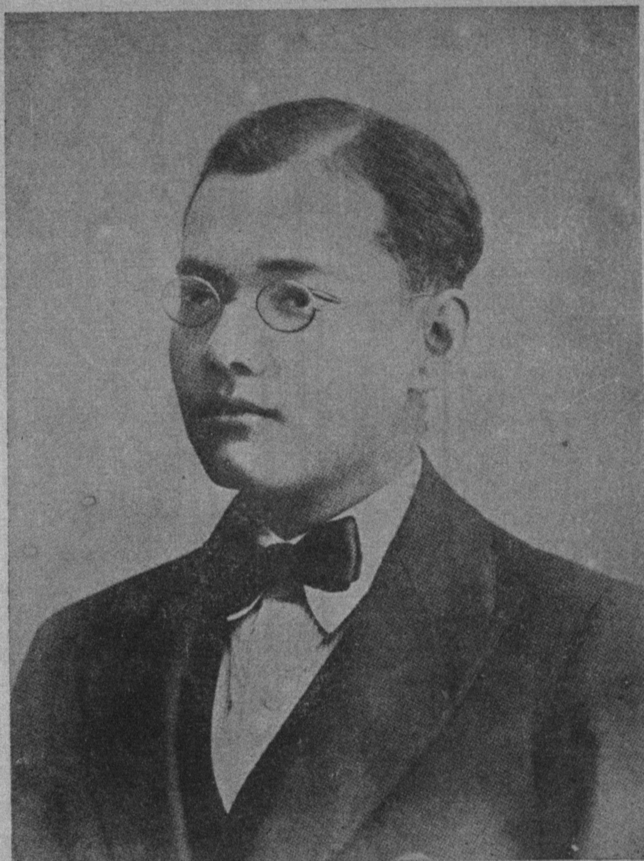
একটি
আশ্চর্য জীবন কথা

নেতাজীর জীবন উদ্দীপনা-পূর্ণ, গৌরবময় এবং রহস্যজনক। তিনি শুধু স্বদেশপ্রেমিকই ছিলেন না—ছিলেন বিরাট সংগঠক ও নির্ভীক যোদ্ধা। পরাধীন দেশকে বিদেশীর শাসন-শাপমুক্ত করে কিভাবে স্বাধীন ভারত গড়ে তুলতে হবে—সে বিষয়ে নেতাজীর মত গভীর দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে ভেবে-ছিলেন আর কে? "আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেবো"—এমন বাণীতে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে পেরে-ছিলেন আর কে? তাই নেতাজী অনন্য—নেতাজী প্রণম্য।

'আমাদের নেতাজী' শুধু নেতাজীর কাহিনী নয়—যুগের কাহিনী—সারা ভারতের বেদনা-ময় ও গৌরবদৃপ্ত কাহিনী।

———

আমাদের নেতাজী—



কেম্ব্রিজে সুভাষচন্দ্র
১৯১৯—২০

॥ ১ ॥

যেন একটি বিদ্যুতের শিখা !

বেণীমাধববাবু তাকালেন ছেলেটির দিকে।

গৌরকান্তি তরুণ বালক। বয়স বারো কি তেরো। চোখে মুখে কী উজ্জ্বল দীপ্তি।

হঠাৎ সাহেবের ছেলে বলেই ভ্রম হয়। পরনে কোট-প্যাণ্ট, চোখে রোল্ডগোল্ডের চশমা। সঙ্গে ধুতি-চাদর পরিহিত এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক।

"কি চাই ?" হেডমাস্টার বেণীমাধব দাস জিজ্ঞেস করলেন।

"বাবু তাঁর ছেলেকে আপনার স্কুলে ভরতি করবার জন্য পাঠিয়ে দিলেন।" জবাব দিলেন প্রৌঢ় ভদ্রলোক।

"বাবু !—"

হেডমাস্টারের কথা শেষ হতে না হতেই প্রৌঢ় ভদ্রলোক বললেন —"জানকীবাবু।"

বেণীমাধববাবু বুঝতে পারলেন। রায়বাহাদুর জানকীনাথ বসুর ছেলে। শিক্ষিতমহলে জানকীনাথকে কে না চেনে কটক শহরে ? ছেলেটিকে কাছে ডাকলেন বেণীমাধববাবু।

"তোমার নাম কি ?"

"সুভাষচন্দ্র বসু।"

"আগে কোন্ স্কুলে পড়তে ?"

"প্রোটেস্টাণ্ট ইওরোপীয়ান স্কুলে।"

কী পরিষ্কার উচ্চারণ! আর কী মধুর বচন-ভঙ্গী। খুশী হলেন বেণীমাধববাবু।

"কোন্ ক্লাসে ভরতি হতে চাও?"

"ক্লাস সেভেন-এ।"

বেণীমাধববাবু থমকে গিয়ে ভাবতে লাগলেন। পারবে কি এতটুকু ছেলে? অন্যান্য স্কুলের চেয়ে এই স্কুলের কোর্স যে কঠিন।

র‍্যাভেনশ কলেজিয়েট স্কুল।

সুভাষ অ্যাডমিশন টেস্ট দিতে বসল। পাসও করল অনায়াসে।

সেদিনই ভরতি হওয়ার সমস্ত ব্যবস্থা হয়ে গেল। বিদেশী স্কুল থেকে স্বদেশী স্কুলে। প্রোটেস্টান্ট ইওরোপিয়ান স্কুলে শুধু ইংরেজী শেখানো হতো। পড়ানো হতো বাইবেল।

সুভাষচন্দ্রের বাবা জানকীনাথ তাই চাইতেন। ছেলেদের ইংরেজী ভাষা ও ইংরেজী আদবকায়দা শেখানোর দিকে ঝোঁক ছিল তাঁর বেশী।

তা হবে না কেন? কটকের সবাই জানে রায়বাহাদুর জানকীনাথ বসু সাহেব-ঘেঁষা লোক। নামজাদা উকিল। একাধারে গভর্নমেণ্ট প্লিডার ও পাবলিক প্রসিকিউটর। তার উপর রয়েছে তার সরকারী খেতাব। কাজেই ছেলেমেয়েদের তিনি ইংরেজী স্কুলে পাঠাবেন এতে আশ্চর্য হবার কি আছে?

১৯০২ সাল থেকে ১৯০৮ সাল—এই সাত বছর সুভাষ সেই পাদরী স্কুলে পড়াশোনা করল। তারপর এল এই র‍্যাভেনশ কলেজিয়েট স্কুলে।

কোট-প্যাণ্ট পরা সুভাষ এই স্কুলের ছাত্রদের দেশী পোশাক দেখে অবাক্ হয়ে গেল। স্বয়ং হেডমাস্টারও পরেন ধুতি-পাঞ্জাবি।

সুভাষও বায়না ধরল বাবার কাছে—ধুতি-পাঞ্জাবি চাই।

অবাক্ হয়ে জানকীনাথ জিজ্ঞেস করলেন—"সে কি! ধুতি-পাঞ্জাবি পরতে পারবে তো?"

"কেন পারব না? আমার বয়সী ছেলেরা তো পরছে।"

"তোমাকে কিন্তু এই পোশাকেই বেশী মানায়।"

"তাই বলে দেশী পোশাক ছেড়ে বিদেশী পোশাক পরব? সবার থেকে আলাদা হয়ে থাকব?"

জানকীনাথ সেদিনই ছেলের ধুতি-পাঞ্জাবির ব্যবস্থা করে দিলেন।

পরদিন স্কুলে যেতেই হেডমাস্টারও অবাক্। বললেন—"তোমাকে না কোট-প্যাণ্ট পরে আসতে দেখেছি?"

সুভাষ জবাব দিল—"হ্যাঁ। ঐ পোশাকটা ছেড়ে দিলাম।"

"কেন?"

"দেখলাম সব ছাত্রই জাতীয় পোশাক পরে আসে, আমি বিদেশী পোশাক পরব কেন?"

বেণীমাধববাবু শুধু বিস্মিতই হলেন না, গর্বিতও হলেন। এমন ছেলেই আমাদের দেশে দরকার।

ছেলেদের ভেতর কানাঘুষা শুরু হয়ে যায়।

"কে রে ছেলেটা? ভারী তো দেমাক।"

"দেমাক থাকলে হবে কি? পড়াশোনায় যে ভারী পাকা।"

"পাকা শুধু ইংরেজীতে। কিন্তু বাংলায় যে একেবারে পণ্ডিত!"

"আর সংস্কৃত? সংস্কৃতেও তথৈবচ।"

অনেক ছেলেই মনে মনে আত্মপ্রসাদ অনুভব করে।

প্রতি বছর ক্লাসে প্রথম হয় চারু। চারুচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। র‍্যাভেনশ কলেজের ইংরেজীর প্রধান অধ্যাপকের ছেলে।

কিন্তু সে বছর বার্ষিক পরীক্ষার ফল বেরুলে দেখা গেল চারু হয়েছে দ্বিতীয় আর প্রথম হয়েছে সুভাষ।

আশ্চর্য, যে সংস্কৃতে ছিল সুভাষ কাঁচা সেই সংস্কৃতেই সে পেয়েছে একশোর মধ্যে একশো!

অবাক্ হলেন বেণীমাধববাবু নিজেও। বিশ্বনাথ কাব্যতীর্থ সংস্কৃতের শিক্ষক। তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন—"সুভাষকে সংস্কৃতে একশোর মধ্যে একশো দিলেন?"

বিশ্বনাথ কাব্যতীর্থ বললেন—"কি করবো? এর বেশী দেওয়ার যে উপায় ছিল না।"

চারু কি সেজন্য দুঃখিত? না। পরাজয়ের গৌরবেও সে অম্লান।

॥ ২ ॥

আঠারোশো সাতানব্বই সালের তেইশে জানুয়ারী।

ভোরের সোনালী সূর্যালোক অভিনন্দিত করল ধরণীকে।

ভারতের আকাশে নূতন জ্যোতিষ্কেরও উদয় হল সেদিন।

বেলা বারোটা দশ মিনিটে বেজে উঠল মঙ্গল-শঙ্খ। মহানদীর তীরে কটক শহরে রায়বাহাদুর জানকীনাথ বসুর ঘরে আনন্দ কলরব উঠল।

জননী প্রভাবতীর কোল জুড়ে জন্ম নিল এক জ্যোতির্ময় শিশু।

সুভাষচন্দ্র।

ধন্য উড়িষ্যার কটক শহর।

পশ্চিম বাংলার কোদালিয়া গ্রাম বুঝি বিস্মৃতির অতল তলে তলিয়ে গেল। বসু পরিবারের আদি নিবাস ছিল চব্বিশ-পরগনার সেই গণ্ডগ্রামে। সে যেন কতকালের কথা। জানকীনাথ বাংলাদেশ ত্যাগ করে চলে এলেন কটকে। ব্যবহারজীবিরূপে ভাগ্যলক্ষীর অপার করুণা লাভ করলেন।

কটক শহর ধন্য হল সুভাষচন্দ্রের জন্মমুহূর্তে।

জানকীনাথের আট ছেলে, ছয় মেয়ে। তার মধ্যে দুটি ছেলে ও চারটি মেয়ের আগেই মৃত্যু ঘটেছে। জীবিত ছেলেরা হলেন—সতীশচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, সুধীরচন্দ্র, সুরেশচন্দ্র, সুনীলচন্দ্র ও সুভাষচন্দ্র।

জানকীনাথ ছেলেদের শিক্ষাদানের ব্যাপারে কখনও কার্পণ্য করেন নি। কারণ তিনি বুঝেছিলেন পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান ও

শিক্ষায় অভিজ্ঞতা লাভ করা সকলের একান্ত প্রয়োজন। যে সমস্ত জাতি বর্তমান জগতে প্রভাব বিস্তার করে বড় হয়েছে তাদের সংস্পর্শে না এলে জগতের বুকে মানুষের মত দাঁড়ান সম্ভবপর নয়।

কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণের আগে দেশীয় শিক্ষাও তো গ্রহণ করা দরকার।

সুভাষচন্দ্রের মধ্যে কি দেখতে পেয়েছিলেন জানকীনাথ কে জানে···কি স্বপ্ন দেখেছিলেন তাকে ঘিরে। হৃদয়ের সমস্ত স্নেহ উজাড় করে দিয়েছিলেন এই সন্তানটির ওপর।

মনের মত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলবার জন্য সুভাষকে দিলেন র‍্যাভেনশ কলেজিয়েট স্কুলে।

উনিশশো এগারো সালের এগারোই আগস্ট।

তিন বছর আগে এমন দিনে ক্ষুদিরামের ফাঁসি হয়েছিল।

বাংলার অগ্নিযুগের প্রথম শহীদের স্মৃতিবার্ষিকী।

সুভাষচন্দ্র বলিল—"এই স্মৃতিবার্ষিকী আমরা পালন করব।"

কিভাবে পালন হবে?

'আগের দিনই সমস্ত পরিকল্পনা স্থির হয়ে গেল। সুভাষ বলল—"আমরা উপোস করে এই পবিত্র স্মৃতিবার্ষিকী পালন করতে চাই। সবাই রাজী?"

এক কথায় রাজী হয়ে গেল সমস্ত ছেলে।

সারাদিন উপবাস।

র‍্যাভেনশ কলেজিয়েট স্কুলের হস্টেলে সেদিন উনুন পর্যন্ত জ্বলল না।

ছাত্ররা ক্লাস করছে রীতিমত—কিন্তু সবাই করেছে উপবাস। কেউ জলগ্রহণ পর্যন্ত করেনি।

ক্লাসের শেষে সবাই জড় হল হস্টেলের ঘরে। পালন করছে সবাই শহীদ স্মৃতিবার্ষিকী।

সুভাষ গল্প বলছে…শুধু গল্প নয়…ইতিহাস…ক্ষুদিরামের কাহিনী …আলিপুর বোমার মামলার কাহিনী…

অত্যাচারী কলকাতার চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ড কিশোর বালক সুশীল সেনকে প্রকাশ্যে পনের ঘা বেত মারবার হুকুম দিলেন। সুশীল সেনের অপরাধ, একটি সাহেবকে সে ঘুষি মেরেছিল।

সেটা কি সত্যি সুশীল সেনের অপরাধ? সাহেব জঘন্য ভাষায় করেছিল ভারতবাসীদের সম্বন্ধে কটূক্তি। জাতির প্রতি এই অপমান সে সহ্য করতে পারে নি। তাই সাহেবকে সে ঘুষি মেরেছিল।

সেই অপরাধে কিংসফোর্ড সাহেব বেত্রাঘাতের আদেশ দিলেন। সুশীল বেত খেয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ল।

বারীন ঘোষ তুলে দিলেন ক্ষুদিরাম আর প্রফুল্ল চাকীর হাতে রিভলবার আর বোমা। বললেন—প্রতিশোধ নাও এই অপমানের। কিংসফোর্ডকে হত্যা করো।

কিন্তু কিংসফোর্ড তখন বদলা হয়ে গেছেন মজঃফরপুরে। সেখানকার তিনি জেলা জজ।

সেদিন ছিল উনিশশো আট সালের তিরিশে এপ্রিল। সন্ধ্যার পর। মজঃফরপুরের স্টেশন ক্লাবের রাস্তার একধারে ক্ষুদিরাম আর প্রফুল্ল আত্মগোপন করে আছে। এই রাস্তা দিয়েই গাড়ি করে কিংসফোর্ড বাড়ি ফিরবেন।

রাত সাড়ে আটটা বেজে গেল। কিংসফোর্ডের গাড়ি দেখা গেল রাস্তার ওপর। কাছে আসতেই তারা বোমা ছুড়ে মারল গাড়িটার দিকে।

কিন্তু ভাগ্য ভাল কিংসফোর্ডের। সেই গাড়িতে তিনি ছিলেন

না। ছিলেন ব্যারিস্টার কেনেডি সাহেবের স্ত্রী আর মেয়ে। তাঁরা দু'জন মারা গেলেন।

পালিয়েও পালাতে পারল না দুই বিপ্লবী।

প্রফুল্ল ধরা পড়বার আগে নিজের রিভলভারের গুলিতে আত্মহত্যা করল। বিচারে ক্ষুদিরামের হল ফাঁসি।

অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে এ আত্মদান—দেশের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ···এর কোন তুলনা নেই।

তরুণ দল উৎসাহিত হয়ে ওঠে···উদ্দীপিত হয়ে ওঠে সুভাষচন্দ্রের বক্তৃতায়।

অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উঠছে তাঁর বিদ্যায়তনের চত্বর থেকেই। বেণীমাধববাবু টের পেলেন। কিন্তু মুখে কিছু বললেন না।

অবশ্য কদিন পরেই বুঝতে পারলেন তার প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে।

ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের একজন প্রতিনিধি এসে হাজির হলেন স্কুলে। বললেন—"আপনিই কি হেডমাস্টার?"

বেণীমাধববাবু বললেন—"হ্যাঁ। আপনার কি চাই?"

প্রতিনিধি বললেন—"ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট আপনার স্কুল সম্বন্ধে কয়েকটি খবর জানতে চান।"

"কি খবর বলুন তো?" বেণীমাধববাবু প্রশ্ন করলেন।

"আপনার স্কুলের ছেলেরা এগারোই আগস্ট ক্ষুদিরামের ফাঁসির দিবস পালন করেছে।"

"করতে পারে।"

"সেদিন তারা উপবাস করেছে।"

"তাও করতে পারে।"

"আপনি হেডমাস্টার হয়ে সে খবর রাখেন না?" উষ্ণ হয়ে উঠলেন প্রতিনিধি।

"সে খবর রেখে আমার কি দরকার? একটি মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে তারা যদি কোন কাজ করে তাতে আমার বলবার কি আছে?"

ক্ষুব্ধ হয়ে চলে গেলেন প্রতিনিধি।

কদিন পরেই বেণীমাধববাবুর নামে এল এক লম্বা চিঠি। শিক্ষাবোর্ড তাঁকে বদলী করেছে কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলে।

উড়িষ্যা থেকে একেবারে বাংলা দেশে। অপরাধ? তিনি স্বদেশীকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন। ছাত্রদের জাতীয়তাবাদী হবার সুযোগ দিচ্ছেন।

খবরটা ছড়িয়ে পড়ল ছাত্রদের মধ্যে। সুভাষের কানেও গেল।

গর্জন করে উঠল সুভাষ। "আমরা প্রতিবাদ করব। হেডমাস্টার-মশাইকে কিছুতেই বদলী হতে দেব না।"

একদল ছেলে নিয়ে সুভাষ ঢুকে পড়ল হেডমাস্টারের ঘরে।

"কি চাও?" চোখ মেলে তাকালেন বেণীমাধববাবু।

"আমরা আপনার বদলীর রদ করতে চাই।" দৃঢ়কণ্ঠে বলল সুভাষ।

বেণীমাধববাবুর কণ্ঠে আর্দ্রতার আভাস ফুটে উঠল। বললেন—"আমার বদলীর চাকরি। বদলী করলেও কোন কিছু করবার নেই।"

সুভাষ বলল—"কিন্তু যে ব্যাপারের জন্য আপনাকে বদলী করছে সেটা অন্যায়। আমরা কেন তা মেনে নেব?"

বেণীমাধববাবু বললেন—"আমাদের কাছে অন্যায় হলেও শিক্ষা বোর্ডের কাছে হয়তো অন্যায় নয়। তাছাড়া আমার বদলীর চিঠিতে তার কিছু উল্লেখ নেই!"

বিদায়ের দিন ঘনিয়ে এল।

সুভাষ প্রণাম করে আশীর্বাদ চাইল। অকুণ্ঠচিত্তে আশীর্বাদ করলেন বেণীমাধববাবু—"তোমার স্বদেশপ্রীতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হোক।"

আশীর্বাদ করার সময়ে দু'ফোঁটা চোখের জলও গড়িয়ে পড়ল বেণীমাধববাবুর চোখ থেকে।

॥ ৩ ॥

বাড়ির বৈঠকখানায় বসে পড়াশোনা করত সুভাষ। তার এক মামাও সেই ঘরে পড়াশোনা করত।

বৈঠকখানা ঘরে চেয়ার টেবিল ও তক্তাপোশ ছিল। আর ছিল বই রাখার জন্য একটি আলমারি।

একদিন সুভাষের মামা একলা বসে পড়ছে, সুভাষ তখনও পড়তে আসে নি। হঠাৎ তার চোখে পড়ল, এক সার লাল পিঁপড়ে দল বেঁধে আলমারির দিকে এগিয়ে চলেছে।

বই ও খাতাপত্রে ভরা আলমারি। সেখানে পিঁপড়ের দল ধাওয়া করবে কি কারণে? মামার মনে কৌতূহল জাগল।

পিঁপড়ের দলের গতিবিধি লক্ষ্য করে বুঝতে পারল তারা দল বেঁধে আলমারীর ভেতরেই ঢুকছে।

কিন্তু কেন! ওখানে তো কোন খাবার জিনিস নেই। তবে দল বেঁধে ঢুকছে কেন?

আলমারির বই সরিয়ে দেখতে লাগল সে। খুঁজতে খুঁজতে যা পেল তা দেখে সে অবাক্। ছু'খানা রুটি। রুটি ছু'খানা রয়েছে বইয়ের থাকের পেছনে। তারই সন্ধান পেয়ে পিঁপড়ের দল এসে জুটেছে।

কিন্তু বইয়ের পেছনে রুটি! এ তো ভারী আশ্চর্যের কথা। রুটি এখানে রাখবে কে?

এমন সময় সুভাষ এসে হাজির হল। মামা বলল—"সুভাষ, তুমি এখানে রুটি রেখেছ?"

সুভাষ যেন চোরের মত হয়ে গেল। বলল—"চুপ, চুপ! কাউকে বলো না।"

"আচ্ছা বলবো না। কিন্তু তাই বলে ওখানে রুটি রেখেছ কেন বল তো?"

"ওটা কাল বিকেলবেলার জলখাবারের রুটি। রাস্তায় যে বুড়ী ভিখারীটা বসে তাকে রোজ আমার রুটি থেকে দু'খানা করে রুটি দিই। কাল বুড়ীকে দেখতে পাই নি। তাই তুলে রেখে দিয়েছি।"

মামা অবাক্ বিস্ময়ে তাকাল সুভাষের দিকে। করুণা মাখানো এক তেজোদ্দীপ্ত মূর্তি!

বিদ্যালয়ে সুভাষের অন্তরঙ্গ বন্ধু চারু।

ছুটির পর দুজনে বেড়ায় নদীর ধারে। অনেক গল্প হয়।

চারু জিজ্ঞেস করে—"বিবেকানন্দ পড়েছ?"

"পড়েছি।"

"কেমন লাগে?"

"খুব ভাল। 'সোঽহং' কথাটির মধ্যে কত বড় তেজ, কত বড় আত্মনির্ভরতা।"

"সত্যি তো। কত বড় সম্ভাবনা লুকিয়ে রয়েছে আমাদের মধ্যে। মানুষ তো ভস্মে ঢাকা বহ্নি!"

সারা বাড়ির মধ্যে সুভাষের সবচেয়ে বেশী সম্পর্ক বাড়ির পুরনো পরিচারিকার সঙ্গে। নাম সারদা। সেই বৃদ্ধাই তাকে কোলেপিঠে করে বড় করেছে। সুভাষের দেখা-শোনা খাওয়া-পরার ভার তার ওপরেই। কাজেই সে-ই বেশী খবর রাখে সুভাষের।

সারদাই একদিন খবর দিল সুভাষ নাকি ইদানিং খুব বাড়াবাড়ি শুরু করেছে।

মা প্রভাবতী ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন "কেন, কি করছে সুভাষ ?"

"কাক পাখি না ডাকতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। ছুটির দিন সারাদিনের মধ্যে তার টিকিটি পর্যন্ত দেখা যায় না।"

"তাই নাকি ? বিষম ভাবনার কথা তো !"

জানকীনাথ ও প্রভাবতীর সঙ্গে বাড়ির ছেলেদের প্রতিদিনের ওঠা-বসার সম্পর্ক খুবই কম। সংসারে অসাচ্ছল্য নেই, স্বাচ্ছন্দ্যের কোন ত্রুটি নেই। জানকীনাথ জানেন সবই ঘড়ির কাঁটার মত চলছে। প্রভাবতীও সারদার ওপর সুভাষের ভার দিয়েই নিশ্চিন্ত।

কিন্তু এমন মতিগতি কেন হল ছেলের ? এতক্ষণ বাইরে বাইরে সে করে কি ?

প্রভাবতী ঠিক করলেন, ছেলের খবর নিতেই হবে। একদিন আড়ি পেতে রইলেন। দেখলেন, চুপি চুপি সুভাষ বাড়িতে ঢুকছে। প্রথমেই সে সারদার ঘরে ঢুকে পড়ল।

প্রভাবতীও সন্তর্পণে সেই ঘরের দিকে এগিয়ে গেলেন। দেখলেন, সারদা সুভাষের পায়ে একটা কাটা জায়গায় মলম লাগিয়ে দিচ্ছে।

সুভাষ বলছে—"তুমি আবার মায়ের কাছে গিয়ে বলো না যেন।"

সারদা বলছে—"আমি না বললেও মা যদি দেখতে পান তাহলে কি হবে ?"

সুভাষ বলছে—"আজকে রাত্রেই ঠিক সেরে যাবে দেখে নিও।"

প্রভাবতী জানকীনাথকে বললেন—"ছেলেকে শাসন করো। সে নাকি আজকাল বেশী পড়াশোনা করছে না। কেবল বাইরে বাইরে কাটায়।"

"তাই নাকি ? কই, এতদিন বলোনি তো সে কথা ?" মনে মনে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করলেন জানকীনাথ।

পরের দিন ভোরবেলায় বাড়ি থেকে বেরুবার মুখেই সুভাষকে

ধরলেন জানকীনাথ। গুরুগম্ভীর কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন—"সারাদিন বাইরে বাইরে কোথায় থাকো?"

সুভাষ স্থির হয়ে নতমুখে দাঁড়াল বাবার সামনে। বলল—"কটকে যে ভয়ানক অসুখ হচ্ছে চারদিকে।"

"তাতে তোমার কি?"

"আমরাই তো স্বেচ্ছাসেবক হয়ে বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে রোগীর সেবা করি।"

"কিন্তু সামনেই তোমার পরীক্ষা, সে খেয়াল আছে? আজ থেকে বাড়ির বাইরে তুমি বেরুতে পারবে না।"

সুভাষ কোন প্রতিবাদ করল না বাবার কথায়। কিন্তু মনে তার ভয়ানক অভিমান হল। ঘরে ফিরে গিয়ে দরজায় খিল দিয়ে পড়তে বসল।

কিন্তু পড়ায় কি আর মন বসে? চোখের সামনে ভেসে উঠল সহপাঠী বন্ধুদের ছবি—যারা পাড়ায় পাড়ায় গিয়ে রোগীদের সেবা করছে। স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শকে স্মরণ করে যারা এগিয়ে চলছে আর্তের সেবায়।

পড়ার কথা কিছুক্ষণের জন্য ভুলে যায় সুভাষ। তাকিয়ে থাকে দেওয়ালে টাঙানো বিবেকানন্দের ছবির দিকে।

মনে মনে বুঝি বলে 'তুমি আমাকে ত্যাগমন্ত্রে দীক্ষা দাও স্বামীজি! সেবার কার্যে আমাকে প্রেরণা দাও!'

হঠাৎ মুখ থেকে অজান্তেই বেরিয়ে আসে স্বামীজির বাণী—

"বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর!
জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।"

॥ ৪ ॥

উনিশশো তেরো সাল।

ম্যাট্রিকুলেশান পরীক্ষার ফল বের হল।

দেখা গেল, সুভাষ দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে।

জানকীনাথ খুব খুশী না হলেও অবাক্ হলেন। সুভাষ ভাল ছাত্র, তার প্রথম হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু পড়াশোনা না করে যেভাবে রোগীর সেবা করে বেড়িয়েছে, তাতে দ্বিতীয় যে হয়েছে সেটাই আশ্চর্য।

প্রভাবতী কিন্তু প্রথমে বিশ্বাসই করতে চাইলেন না। বললেন—"আমার সুবি ছাড়া আর কে ফার্স্ট্ হবে?"

এবার ছেলেকে পাঠাতে হবে কলকাতা। তারই ব্যবস্থা হল।

কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে ভরতি হল সুভাষ। বাংলার সেরা কলেজ প্রেসিডেন্সি। অধ্যাপকদের মধ্যে রয়েছেন জগদীশচন্দ্র বসু, মনোমোহন ঘোষ, পি. সি রায় ও প্রফুল্ল ঘোষ।

ছোট শহর থেকে রাজধানীতে এসে সুভাষ যেন নতুন জীবন লাভ করল। চঞ্চল হয়ে উঠল মন।

এখানে এসে এক নতুন বন্ধু লাভ করল সে। সহপাঠী দিলীপকুমার রায়। বিখ্যাত নাট্যকার ডি, এল, রায়ের ছেলে।

ডি, এল, রায়ের গান, ডি, এল, রায়ের নাটক সুভাষচন্দ্রের কত প্রিয়। তাঁর ছেলের সঙ্গে আলাপ করে সুভাষের খুবই আনন্দ হল।

দিলীপও গান জানে। ভাল গান গায়।

সুভাষ অগ্রণী হয়ে কলেজে যে ডিবেটিং ক্লাব করেছে তাতে দিলীপ যোগ দেয়। কিন্তু খুব বেশী আগ্রহ দেখায় না। ওর মনে যেন কিছুটা আধ্যাত্মিক ভাব।

সুভাষ এল একদিন দিলীপকে ডাকতে। বলল—"চল্ যাই ডিবেটিং ক্লাবে।"

দিলীপ বলল—"তোদের ঐ ডিবেটিং ক্লাবের ওপর কিন্তু আমার খুব আস্থা নেই।"

"কেন রে ?"

"কি হবে তর্কযুদ্ধ করে ?"

"সে কি ! আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক ও বক্তৃতার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। দেশে এখন দরকার বড় বড় নেতার আর তর্কযোদ্ধার।"

"তাতেই কি দেশ স্বাধীন হবে ?"

"দেশের মানুষের ভেতর উৎসাহ জাগাতে হবে, দেশে বিপ্লব সৃষ্টি করতে হবে।"

দিলীপ মুগ্ধ হয়ে শোনে। কিন্তু সায় দেয় না। বলে—"এটা তোমার আকাশকুসুম কল্পনা। আগে নিজেকে তৈরি করতে হবে।"

"কি ভাবে তৈরি করবে নিজেকে ?"

"যোগসাধনা করে। দেশের মুক্তির প্রশ্ন অনেক দূরে। আগে নিজের মুক্তির পথ তৈরি কর।"

সুভাষের মন বদলে গেল ধীরে ধীরে। সে ঠিক করল, প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে কৃচ্ছ্রসাধন করবে।

আমাদের দেশের সাধু-সন্ন্যাসীরা নিজেদের মনের শক্তি বাড়াবার জন্য কৃচ্ছ্রসাধন করতেন। দেহ ও মনকে গড়ে তোলবার জন্যই করতেন তাঁরা কঠোর অভ্যাস। এই সব কঠোর অভ্যাসের দ্বারাই

তাঁরা অর্থলালসা, বিলাসিতা প্রভৃতি কুপ্রবৃত্তিকে জয় করবার চেষ্টা করতেন। নানা দুঃখ-কষ্টেও তাঁরা আর দুঃখবোধ করতেন না।

মানুষের সেবায় যাঁদের জীবন উৎসর্গ করতে হবে, তাঁদের দেহ ও মনকে এমনি কঠোরভাবে গড়ে তুলতে না পারলে তাঁরা কিছুতে দুঃখ-কষ্ট ও নির্যাতনকে জয় করতে পারেন না। কিশোরকাল থেকেই সুভাষ তার জীবনের যে আদর্শ বেছে নিয়েছিল, তাতে দেহ ও মনকে কঠোরভাবে গড়ে তোলবার জন্যই নিল কৃচ্ছ্রসাধনের সংকল্প।

একদিন মনে কি ভাব হল কে জানে।

এল কৃষ্ণনগরে, বন্ধু হেমন্ত সরকারের বাড়িতে। হেমন্ত সরকার কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলের শিক্ষার্থী—বেণীমাধববাবুর ছাত্র। সেই সুবাদে সে কটকে বেড়াতে গিয়ে সুভাষের বাড়িতে উঠেছিল। তখন থেকেই আলাপ ও বন্ধুত্ব।

সুভাষকে তার বাড়িতে আসতে দেখে অবাক্ হয়ে গেল হেমন্ত।

"একি তুমি ?"

"হ্যাঁ এলাম। বাড়িতে ভাল লাগছে না।"

বেড়াতে বেড়াতে দু'বন্ধুতে অনেক কথা হল।

সুভাষ বলল—"আমি সন্ন্যাসী হব ঠিক করেছি। বাড়িতে আর ফিরব না।"

অবাক্ হয়ে হেমন্ত তাকাল সুভাষের মুখের দিকে—"সত্যি ?"

হাঁটতে হাঁটতে তারা চলে এল নদীর ধারে ইন্দ্রদাস বাবাজীর আশ্রমে। আশ্রম নয়, গাছের নীচে আস্তানা। শীতে গ্রীষ্মে বর্ষায় সাধু থাকেন খোলা আকাশের নীচে। কেউ কিছু দিলে খান, না হয় উপোস করে থাকেন।

গাছটার কাছে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল দু'জনেই।

উদাসী সম্প্রদায়ের শিখ সন্ন্যাসী। মাটিতে শুয়ে আছেন। একটি সাপ তাঁর গায়ের উপর দিয়ে চলে গেল। একটুও চঞ্চল

হলেন না সাধু। নিরাসক্ত, নির্ভয়। কাম ক্রোধ লোভ ভয় সব কিছুকে জয় করেছেন।

দু'বন্ধু নির্বাক্ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। সন্ন্যাসী ডাকলেন। তারা কাছে যেতেই সন্ন্যাসী জিজ্ঞেস করলেন—"কি চাস বেটা। বিমারের দাওয়াই ?"

হেমন্ত বলল—"না, দাওয়াই চাই না।"

সুভাষ বলল—"আপনার মত ভয়-ডরশূন্য যেন হতে পারি, সেই মন্ত্র দিন। আমাদের শিষ্য করে নিন আপনার।"

সাধু হাসলেন। বললেন—"চঞ্চল হোস নে বেটা। আগে মন থির কর্। যাওয়া আসা কর্। সব দেখে নে, বুঝে নে। তারপর শিষ্য হবি।"

দু'বন্ধু চুপ করে বসে রইল সেখানে।

শুধু সেদিন নয়, আরও কয়েকদিন। দু'জনেই নিয়মিত যাতায়াত করতে লাগল। কিন্তু সাধু দীক্ষা দিলেন না।

একদিন তারা গিয়ে দেখল সাধু পুঁটলি বেঁধে কমণ্ডলু নিয়ে বসে আছেন। তারা কাছে যেতেই সাধু বললেন—"চলে যাচ্ছি বেটা।"

"কোথায় যাচ্ছেন ?"

"আমাদের কি কোন ঠিকানা আছে ? এক জায়গায় বেশী দিন আমাদের থাকতে নেই। মায়া পড়ে যায়। তোদের ওপরও মায়া পড়ে যাচ্ছে।"

"আমাদের শিষ্য করে নিলেন না ?"

"না। আমি তোদের গুরু হবার উপযুক্ত নই। তোদের গুরু রয়েছে অন্য জায়গায়।"

সাধু চলে গেলেন।

ওদিকে কলকাতায় এলগিন রোডের বাড়িতে হুলস্থূল কাণ্ড! সুভাষ নেই। কোথায় গেল সে? একদিন গেল—দুদিন গেল—তিনদিন গেল—সুভাষ আর ফিরল না।

প্রভাবতী কাঁদতে লাগলেন। বললেন—"ছেলে আমার নিশ্চয়ই সন্ন্যাসী হয়ে চলে গেছে। চারদিকে লোক পাঠাও। টেলিগ্রাম করো।"

জানকীনাথ বললেন—"ব্যস্ত হয়ো না। যা করবার তা করছি।"

খোঁজ নেওয়া হল অনেক জায়গায়। আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবদের কোন বাড়ি বাদ গেল না। লোক গেল বেলুড় মঠে, দেওঘরে। কিন্তু কোথাও খোঁজ পাওয়া গেল না।

ওদিকে সুভাষ আর হেমন্ত বেরিয়ে পড়ল গুরুর খোঁজে। কোথায় গুরু?

সাদা জামাকাপড় ছেড়ে দু'জনেই পরল গেরুয়া। এল হরিদ্বারে।

হাঁটতে হাঁটতে দুজনেই ক্লান্ত হয়ে পড়ল। খিদেও পেল খুব। একটা হোটেলে গিয়ে উঠল কিছু খাবার জন্য।

কিন্তু হোটেলওয়ালা অবাক্ হয়ে গেল দু'জন সন্ন্যাসীকে হোটেলে ঢুকতে দেখে। জিজ্ঞেস করল—"সে কি, আপনারা হোটেলে খাবেন?"

সুভাষ বলল—"ক্ষতি কি? আমরা স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্য। আমাদের কাছে কোন বাছবিচার নেই।"

"আপনারা বাঙালী?"

"হ্যাঁ, বাঙালী।"

"আপনারা মছলি খাওয়ার জাত। এখানে আপনারা খেতে পারবেন না।"

"আমরা তো এখানে মছলি খাচ্ছি না।"

"তবু আপনারা এখানে খেতে পারবেন না। মছলিখোরদের আমাদের এখানে ঠাঁই নেই।"

হেমন্ত বললে—"যদি খাবার কিনে নিয়ে বাইরে খাই ?"

"তা পারেন।"

হেমন্ত তাই করতে যাচ্ছিল। কিন্তু সুভাষ বাধা দিল। বলল—"দরকার নেই এখানে খেয়ে।"

দু'জনে আবার হাঁটতে লাগল। অনেকদূর গিয়ে পেয়ে গেল একটা আশ্রম।

"চল্ এখানে যাই। যদি কিছু খাবার মেলে।"

কিন্তু আশ্রমে ঢুকতেই সন্ন্যাসী জিজ্ঞেস করলেন—"তোমরা ?"

"হ্যাঁ।"

"তাহলে এখানে তোমাদের ঠাঁই হবে না।"

"কেন আমরা মাছ-খেকো বলে ?"

"না। বাঙালীরা বড় ভয়ানক জাত। তারা বিপ্লবী। ইংরেজদের ওপর বোমা ছোড়ে।"

"কিন্তু আমরা যে সন্ন্যাসী।"

"তবু বাঙালীদের বিশ্বাস নেই। অনেক বিপ্লবী গেরুয়া পরে পুলিসের চোখকে ফাঁকি দেয়।"

আশ্রমেও ঠাঁই মিলল না। দু'জনেই আবার পথে নেমে পড়ল।

আর হরিদ্বার নয়। এবার চললো বৃন্দাবনের দিকে।

কিন্তু সেখানে গিয়ে পৌঁছুতেই পাণ্ডারা ছেঁকে ধরল। "আপনারা কোথায় যাবেন ? আমার এখানে আসুন। ভালো বন্দোবস্ত। কোন অসুবিধা হবে না।"

সুভাষ বলল—"আমরা গুরুকুল যাব !"

পাণ্ডারা জিভে কামড় দিয়ে বলল—"সর্বনাশ, ওখানে যাবেন না। কোন হিন্দুর ওখানে যেতে নেই।"

"কেন ?"

"ওটা আর্যসমাজীদের আশ্রম। আর্যসমাজীরা হিন্দু নয়। ওরা প্রতিমা পূজা মানে না।"

"তাতে কি হয়েছে ? তবু আমরা যাবো।"

সব জায়গাতেই বাধা। বড় অস্বস্তি বোধ করে সুভাষ।

বৃন্দাবন থেকে গেল আগ্রা, আগ্রা থেকে কাশী তারপর মাঝপথে এলো গয়ায়। গয়ার মঠে গিয়ে উঠল তারা।

দলে দলে সকলে পাত পেতে বসেছে। সুভাষ আর হেমন্তও বসে পড়ল।

একজন সন্ন্যাসী এসে জিজ্ঞেস করল—"আপনারা কি জাত ?"

"জাত ? কেন জাতের দরকার কি ?" অবাক্ হয়ে জিজ্ঞেস করল সুভাষ।

সন্ন্যাসী বলল—"যারা ব্রাহ্মণ তারা বসবে এই দিকে আর যারা ব্রাহ্মণ নয় তারা বসবে ঐ দিকে।

সে কি ! সন্ন্যাসীদের মধ্যেও জাত বিচার ?

আর খাওয়া হল না। উঠে পড়ল দু'জনেই।

হাঁটতে লাগল পা চালিয়ে। বড় তেষ্টা পেয়েছে।

খিদে চুলোয় যাক। এখন জল পেলে জীবন রক্ষা।

হাঁটতে-হাঁটতে পথের পাশে একটা কুয়ো পাওয়া গেল। বালতি বাঁধা একটা দড়ি ঝুলছে পাশে। তা দেখে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল দু'জনেই।

দূরে যে একজন পাহারাদার ছিল তা লক্ষ্য করেনি তারা। দড়িটা ধরতেই সে ছুটে এল। জিজ্ঞেস করল—"আপনারা কোন্ জাত ?"

সুভাষ বিস্ময়ে হতবাক্। "কেন ?"

"বামুন হলে দড়ি ধরতে পারবেন।"

"তা না হলে ?"

"আমি জল তুলে দেব। আপনারা খাবেন।"

খিদে আগেই মাথায় উঠেছিল। এবার তেষ্টাও মাথায় উঠল।

সুভাষ বলল—"কাজ নেই জল খেয়ে। এবার চলো।"

হেমন্ত বলল—"কোথায় যাবে ?"

"বাড়ি !"

"সত্যি বাড়ি ফিরবে ?"

"ফিরবো না তো কি ? সন্ন্যাসে আমার দরকার নেই। এখানেও ছুতমার্গ। গুরু এখানে কোথায় মিলবে ?"

দু'জনেই ফিরে চলল।

এলগিন রোডের বাড়ির লোকেরা হতাশ হয়ে পড়েছে। সুভাষের আশা প্রায় ছেড়েই দিয়েছে সকলে। জননী প্রভাবতী তবু অশ্রুমাখা নয়নে প্রতীক্ষা করছেন সন্তানের জন্য।

এমন সময় বাড়ির দোরগোড়ায় এসে দাঁড়াল সুভাষ। সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে।

"কে, সুবি এলি ?"

হ্যাঁ সত্যি, সুবিই তো ! সুভাষ নিজেই ফিরে এসেছে বাড়িতে।

মা আনন্দে জড়িয়ে ধরলেন ছেলেকে।

সারদা ছুটে এল সুভাষ ফিরে এসেছে শুনে। এসে সুভাষের পিঠে হাত বুলাতে লাগল। বলল—"সুবি, তুই এসেছিস ? তোর জন্য ভেবে ভেবে আমরা অস্থির।"

সুভাষ হেসে বলল—"এসেছি তো ! এবার স্থির হও।"

সারদা বলল—"তুমি এবার স্থির হয়ে বাড়িতে বসো। কখনো এ রকম পাগলামি করো না। বুঝলে ?"

আবার পড়াশোনায় মন দিল সুভাষ।

ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষা হয়ে গেল। কিন্তু ফল বিশেষ ভাল হল না। প্রথম বিভাগে পাস করল সুভাষ। কিন্তু বিশেষ কোন স্থান অধিকার করল না।

বন্ধুরা এ নিয়ে অনেক কথা বলল সুভাষকে।—"কিরে এমন হল কেন?"

সুভাষ হেসে জবাব দিল—"হয়ে গেল, আর কি করব? বি. এ. পরীক্ষায় এর শোধ তুলব।"

বি. এ.-তে দর্শনশাস্ত্রে অনার্স নিল সুভাষ। প্রেসিডেন্সী কলেজেই পড়তে লাগল।

ভাবল এবার মন দিয়ে পড়াশোনা করবে।

কিন্তু তার উপায় কোথায়?

দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়া দিনে দিনেই ঘোরালো হয়ে উঠছে।

একদিন খবর পাওয়া গেল গভর্নমেণ্ট 'বঙ্গ আমার জননী আমার' গানটার প্রচার বন্ধ করে দিচ্ছে।

খেপে উঠল ছেলের দল। হিন্দু হস্টেলের ঘরে ছাত্রদের সভা বসল। সুভাষও গিয়ে হাজির হল সেই সভায়।

স্থির হল এবারকার বার্ষিক অনুষ্ঠানে এই গানটি গাওয়া হবে। সভাপতি করা হবে ইতিহাসের অধ্যাপক ই. এফ. ওটেনকে।

"তিনি রাজী হবেন তো?"

"দেখা যাক রাজী হন কি না।"

সভাপতি হতে রাজী হলেন ওটেন। তিনি অত কিছু হয়তো ভেবে দেখেন নি।

সভা শুরু হল। ছাত্ররা উদ্বোধন সংগীত গাইল কয়েকজন মিলে 'বঙ্গ আমার জননী আমার ধাত্রী আমার আমার দেশ।'

ওটেন সাহেব তখনই উসখুস করতে লাগলেন। বক্তৃতা দেওয়ার সময় তাঁর সে রাগ ফেটে পড়ল। বললেন "ইউ বেঙ্গলিজ আর বার্বেরিয়ানস—"

ছাত্রদের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দিল। বক্তৃতা শেষ করতে পারলেন না ওটেন। সভা ছেড়ে চলে গেল সব ছাত্ররা। শূন্য হয়ে গেল সভাস্থল।

ছিঃ ছিঃ, কী অপমান। ওটেন সাহেব শুধু ছাত্রদের নয় বাঙালী জাতকে পর্যন্ত অপমান করল। এর প্রতিশোধ চাই!

সুভাষ বলল—"এর প্রতিশোধ নিতেই হবে। চুপ করে বসে থাকলে চলবে না।"

কেউ কেউ বলল—"আগে চলো, প্রিন্সিপ্যালকে ব্যাপারটা জানাই। দেখি তিনি কি বলেন।"

"বেশ, মন্দ নয়, চলো।"

প্রিন্সিপ্যাল এইচ. আর. জেমস। তিনিও সাহেব। ছাত্ররা অভিযোগ করতে তিনি উলটে আরো রেগে গেলেন। বললেন—"অন্যায় তোমাদের, মিঃ ওটেনের কাছে তোমাদেরই ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত।"

কা আশ্চর্য! সাহেব বলে তার সাতখুন মাপ! আর যত দোষ চাপল গিয়ে ছাত্রদের ঘাড়ে!

"এর প্রতিবাদ করতে হবে। সহ্য করলে অন্যায় আরো বেড়ে যাবে।" দৃপ্তকণ্ঠে বলল সুভাষ।

"কি করব আমরা?"

"ধর্মঘট!"

"ধর্মঘট?"

"হ্যাঁ, পিকেটিং করব। কোন ছাত্রকে কাল ঢুকতে দেব না ক্লাসে।"

তাই হল। সুভাষকে দলপতি করে শুরু হল কলেজের গেটে পিকেটিং।

অধ্যক্ষ এবং অধ্যাপকরা প্রায় সবাই কলেজে এসে গিয়েছেন। ছাত্ররা আসেনি এখনো। পিকেটিং শুরু হল। কোন ছাত্রকে ঢুকতে দেওয়া হল না।

প্রেসিডেন্সীর মতো কলেজে ধর্মঘট! হইচই পড়ে গেল সারা কলকাতা শহরে।

প্রথম দিন খুব জোরালো ধর্মঘট হল। দ্বিতীয় দিনও চললো ধর্মঘট।

কয়েক দিন পর প্রিন্সিপ্যালের ঘর থেকে ডাক পড়ল লিডারের। এই ব্যাপারে ছাত্রদের লিডার কে? সুভাষচন্দ্র বসু।

সুভাষ গিয়ে দাঁড়াল প্রিন্সিপ্যালের সামনে। সেখানে ওটেনও উপস্থিত। ওটেন দুঃখ প্রকাশ করলেন।

সে কি প্রিন্সিপ্যালের কথায় না অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র বসুর অনুরোধে? ঠিক বোঝা গেল না। ওটেনের মুখে চোখে কিন্তু বিনয়ের বা অনুশোচনার কোন ভাব নেই।

যা হোক, পিকেটিং বন্ধ হল।

কিন্তু ওটেনের মনের ঝাল তখনো মেটেনি। বাঙ্গালী ছেলেদের কাছে অণুমাত্র দুঃখ প্রকাশ করাটাও বুঝি তাঁর আত্মমর্যাদার পক্ষে হানিকর।

একদিন ক্লাসে পড়াচ্ছেন ওটেন। এমন সময় ঘরের সামনের বারান্দা দিয়ে অন্য ক্লাসের একটি ছেলে চলে গেল। পায়ের জুতোর শব্দ হল একটু বেয়াড়া রকম।

ওটেন পড়ানো বন্ধ করে সেদিকে তাকালেন। তাঁকে ব্যঙ্গ করবার জন্যই কি এই শব্দ! শব্দটা মিলিয়ে যেতেই পড়ানোতে মন দিলেন আবার।

ছেলেটি হয়তো কোন দরকারে গিয়েছিল। তাই সেই পথ দিয়েই ফিরে এল আবার। আবার জুতোর শব্দ হল।

ওটেন বেরিয়ে এলেন ক্লাস ছেড়ে। ছেলেটিকে মারলেন জোরে এক ঘুষি। আচমকা ঘুষি খেয়ে ছেলেটি পড়ে গেল। একটি ছেলে এগিয়ে এল সহপাঠী বন্ধুকে সাহায্য করতে ; কিন্তু ওটেন তাকেও ধাক্কা মেরে ফেলে দিলেন।

ক্লাসে বসে যে সব ছেলেরা ব্যাপারটিকে লক্ষ্য করছিল তারা আর স্থির থাকতে পারল না। ছুটে এল ক্লাস ছেড়ে। কিছুক্ষণের মধ্যে ছাত্রদের ভিড় জমে গেল। ছুটি হতে না হতে সিঁড়ির তলায় বসে গেল মিটিং।

সুভাষ বলল—"এবার আর ধর্মঘট নয়। অন্য কোন ব্যবস্থা করতে হবে।"

"কি ব্যবস্থা ?"

"সে ব্যবস্থা করতে হবে খুব চুপি চুপি।"

চুপি চুপিই পরামর্শ চলতে লাগল।

এমন সময় দেখা গেল ওটেন নামছেন সিঁড়ি দিয়ে। চুপ, চুপ ! সরে যা !

ছেলেরা সরে গেল। ওটেন নামতে লাগলেন নীচের দিকে। যেই কাছে এলেন অমনি কয়েকটি ছেলে তাঁকে ঘিরে ধরল। চটাপট মারতে লাগল কিল আর ঘুষি। ওটেন মাটিতে পড়ে গেলেন। উঠে বসবার আগেই দেখলেন ছেলেরা কোথায় পালিয়ে গেছে।

ইংরেজের গায়ে হাত ! বিরাট হুলুস্থুল পড়ে গেল চারদিকে।

প্রিন্সিপ্যাল জেমস ডেকে পাঠালেন প্রত্যেক ক্লাসের ছাত্র প্রতিনিধিকে।

কে মেরেছে ওটেন সাহেবকে ? কারা ছিল সিঁড়ির গোড়ায় ? ঘটনা কে কে দেখেছে ?

কেউ কোন কথা বলে না।

ছাত্রদের দলনেতা হিসাবে ডাক পড়ল সুভাষের। জেমস গম্ভীরকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন—"তুমি ঘটনার সময় তো ওখানে ছিলে?"

"হ্যাঁ।"

"ওটেনকে তুমি মেরেছ?"

"না।"

"কে কে মেরেছে তাদের নাম বলতে পারো?"

"না।"

এবার ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন জেমস। "তুমি ছিলে অথচ কে কে মেরেছে তা বলতে পারো না, এ কখনো হতে পারে না। নাম তোমাকে বলতেই হবে।"

সুভাষ স্থির অচঞ্চল। তার মুখে একই জবাব—"না "

"তোমাকে আমি সাসপেণ্ড করলাম।"

"বেশ, তাই করুন। ধন্যবাদ।"

সুভাষ বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

॥ ৫ ॥

সুভাষ সাসপেণ্ড হল প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে!

মা প্রভাবতী বললেন—"বেশ হয়েছে। যেমন মোড়লি করতে গিয়েছিল তেমনি তার ফল।"

মেজদা শরৎচন্দ্রের কিন্তু অন্য মত। তিনি বললেন—"না এটা হতে পারে না। গভর্নমেণ্ট থেকে এক কমিশন বসেছে এই ব্যাপারের তদন্তের জন্য। এ অবস্থায় প্রিন্সিপ্যালের কোন ক্ষমতা নেই কোন ছাত্রকে সাসপেণ্ড করবার।"

তাহলে কি হবে?

এ ব্যাপারে কোন আইনজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া দরকার।

কার কাছে যাবে? কে নিঃস্বার্থভাবে সুপরামর্শ দেবে? দরদী মন নিয়ে কে বিষয়টি বিবেচনা করে দেখবে? এমন কে আছে?

সি. আর. দাশ। চিত্তরঞ্জন দাশ। এই নামটি মনের মধ্যে বার বার জেগে উঠতে লাগল সুভাষের।

রাত্রিবেলায় আহারে বসেছেন চিত্তরঞ্জন। এমন সময় বেয়ারা এসে চিরকুট দিল। চিরকুটে লেখা—সুভাষচন্দ্র বসু, থার্ডইয়ার স্টুডেণ্ট, প্রেসিডেন্সী কলেজ।

নামটা যেন চেনা চেনা মনে হচ্ছে!

খাবার টেবিল থেকে উঠে এলেন চিত্তরঞ্জন। বৈঠকখানায় এসে দেখলেন একটি প্রিয়দর্শন তরুণ দাঁড়িয়ে আছে।

"তুমিই সুভাষ! বসো!"

সুভাষ বসল। বসার আগে প্রণাম করল চিত্তরঞ্জনকে।

"কি খবর? তোমাদের কলেজের গোলমাল মিটল?"

"না। প্রিন্সিপ্যাল আমাকে সাসপেণ্ড করেছেন।"

"সাসপেণ্ড!" একটু চিন্তিত হলেন চিত্তরঞ্জন।

"আপনি নিশ্চয়ই জানেন, গভর্নমেণ্ট তদন্ত কমিটি বসিয়েছেন। তাঁদের রায় বেরুবার আগেই কি প্রিন্সিপ্যাল আমাকে সাসপেণ্ড করতে পারেন?"

"তোমার যুক্তিটা চমৎকার।" চিত্তরঞ্জনের চোখে মুখে একটা আত্মপ্রত্যয়ের ভাব ফুটে উঠল। "দেখা যাক, কমিশন কি রায় দেয়। তারপর প্রিন্সিপ্যালের হুকুম বদলানো যায় কিনা দেখব।"

প্রণাম করে ধীর পায়ে চলে গেল সুভাষ।

চিত্তরঞ্জন বললেন—"তুমি মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে এসে দেখা করো।"

কমিশনের তদন্ত শুরু হল। রায়ও বের হল।

রায় বিপক্ষেই গেল সুভাষের। প্রিন্সিপ্যাল যে অর্ডার দিয়েছেন সেটাই বহাল রইল। রাস্টিকেশন।

অন্য কলেজে ভরতি হবার অনুমতি চেয়ে দরখাস্ত করল সুভাষ। কিন্তু অনুমতি মিলল না।

বড়দা সুরেশচন্দ্র বললেন—"কি রে সুবি, এবার কি করবি? এখানকার কলেজের পড়া তো ঘুচল।"

মেজদা শরৎচন্দ্র বললেন—"তুই বরং কটক চলে যা। মা বাবা সেখানে রয়েছেন। বাবা কি বলেন দ্যাখ্।"

সুভাষ সেটাই ভালো মনে করল। চলে গেল কটক।

জানকীনাথ ও প্রভাবতী সুভাষকে দেখে অবাক্।

"কি রে, তুই হঠাৎ চলে এলি!"

"কি করবো, কলকাতার কোন কলেজেই যে ভরতি হতে পারলাম না।"

সব কথা শুনে চিন্তিত হলেন জানকীনাথ। ছেলের ওপর খুব রাগও করলেন। অভিমান-ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন—"লিডারগিরি করে করে নিজের কেরিয়ারটাকে নষ্ট করছ। ভেবেছিলাম তোমাকে বিলেত পাঠিয়ে—"

"বেশ, আমাকে বিলেতেই পাঠিয়ে দিন বাবা, সেখানে পড়াশোনা করবো।"

"কিন্তু তোমার ওপর যে রাস্টিকেশনের কলঙ্ক ঝুলছে। সেটাকে আগে দূর করো। এখানে ইংরেজ রাজত্ব—ওটাও ইংরেজদের দেশ, সেখানে গিয়ে মুখ দেখাবে কেমন করে?"

আবার কলকাতায় ফিরে এল সুভাষ।

গেল চিত্তরঞ্জনের কাছে। শুধু চিত্তরঞ্জনের কাছেই নয়। বাসন্তী দেবীর কাছেও। বাসন্তী দেবীর অপার স্নেহ লাভ করল সুভাষ। ঘরের ছেলের মত হয়ে গেল সে।

চিত্তরঞ্জন উৎসাহ দেন সুভাষকে। নানারকম পরামর্শ দেন।

একদিন সুভাষ চলে গেল স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে। নির্ভয়ে গিয়ে দাঁড়াল 'বাংলার বাঘে'র সামনে।

আশুতোষ জিজ্ঞেস করলেন—"কি চাই?"

সুভাষ প্রণাম করে বলল—"আমার একটা ব্যবস্থা করে দিন।"

"কিসের ব্যবস্থা?"

"কলেজে ভরতি হবার।"

"বাধা কি?"

"সাসপেনসন অর্ডার তুলে না নিলে কোন কলেজেই ভরতি হতে পারছি না। দুটো বছর এমনি করে নষ্ট হয়ে গেল।"

আশুতোষ এবার চিনতে পারলেন সুভাষচন্দ্রকে। কারণ তদন্ত কমিশনের তিনিও একজন সদস্য ছিলেন।

বললেন—"তুমি তো ম্যাট্রিকুলেশনে সেকেণ্ড হয়েছিলে, তাই না?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"আই. এ. তে খারাপ করলে কেন?"

সুভাষ নিরুত্তর।

আশুতোষ বললেন—"বাজে ব্যাপার নিয়ে হইহই করলে কি আর পড়াশোনা হয়?"

"এবার রেজাল্ট নিশ্চয়ই ভাল হবে স্যার। আমাকে বি. এ. পড়বার সুযোগ দিন।"

"আবার যে গোলমাল করবে না তার নিশ্চয়তা কি?"

"কিন্তু গোলমাল কি মিছামিছি করি?"

সুভাষের অকুতোভয়তা ও স্পষ্টবাদিতায় মুগ্ধ হলেন আশুতোষ। বললেন—"মন দিয়ে পড়াশোনা করো। এমন একটা সুন্দর জীবনকে নষ্ট করে দিও না।"

"তাহলে আমি কলেজে ভরতি হবার সুযোগ পাবো তো?"

"হ্যাঁ পাবে। সেই ব্যবস্থাই আমি করে দিচ্ছি। কিন্তু মনে থাকে যেন, সত্যিকার মানুষ তোমাকে হতে হবে।"

॥ ৬ ॥

স্কটিশচার্চ কলেজে ভরতি হল সুভাষ।

দু' বছর বিরতির পর আবার শুরু করে অধ্যয়ন-তপস্যার নূতন অধ্যায়। একঘেয়েমি ও জড়তা মনকে দমিয়ে রাখতে চায়। তবু সাধ্য-সাধনা করে উদ্যমকে ফিরিয়ে আনে।

ভালো করে পড়াশোনা করতেই হবে—ডিস্টিংশন তাকে পেতেই হবে।

পড়াশোনার মাঝে বৈচিত্র্য খোঁজে সুভাষ। খোঁজে উৎসাহ, আনন্দ।

এমন সময় খবর এল ইণ্ডিয়া ডিফেন্স ফোর্সে ছাত্রবাহিনী গড়ে তোলবার জন্য গভর্নমেণ্ট অনুমতি দিয়েছেন।

আনন্দে বুক দুলে উঠল সুভাষের। যাক, এবার একটা বৈচিত্র্য পাওয়া গেল। সেনাবাহিনীতে ঢুকবার সুযোগও পাওয়া গেল একটা।

সৈনিকের পোশাক পরে চাঁদমারিতে বন্দুক চালানো শিক্ষার জন্য যেদিন প্রথম গেল সুভাষ, সেদিন তার কী আনন্দ! মনের মধ্যে এক নতুন উত্তেজনা—নতুন স্বপ্ন। সে স্বপ্ন সংগ্রামের—সে স্বপ্ন স্বাধীনতার।

এবার সন্ন্যাসী থেকে সৈনিক!

তাই বলে পড়াশোনায় মোটেই অবহেলা করল না সুভাষ।

বি. এ. তে দর্শনে ফার্স্ট ক্লাস সেকেণ্ড হল।

ফার্স্ট ই হতো। কিন্তু অনভ্যস্ত মনকে বশে আনতে হয়তো একটু বেগ পেতে হয়েছিল সুভাষকে।



কটকের বাগান-বাড়ীতে ১৯০২ সালে। বাঁদিক হইতে সুধীরচন্দ্র, সতীশচন্দ্র, সুনীলচন্দ্র, জানকীনাথ বসু, সুভাষচন্দ্র (৫ বৎসর বয়স), শরৎচন্দ্র ও সুরেশচন্দ্র।

তবু পরীক্ষার ফল দেখে খুশী হলেন বাড়ির সকলে। খুশী হলেন চিত্তরঞ্জন। খুশী হলেন আশুতোষও।

'বাংলার বাঘ'-এর মান রক্ষা করেছে সুভাষ।

এবার? এবার কি?

পিতার কাছে নতমস্তকে গিয়ে দাঁড়াল সুভাষ।

জানকীনাথ বললেন—"তুমি তো বিলেত যেতে চেয়েছিলে পড়াশোনা করবার জন্য। যাবে?"

"হ্যাঁ যাবো।"

"বেশ, বিলেত গিয়ে আই. সি. এস.টা দিয়ে এসো। আমি চাই দেশে ফিরে এসে একটা ভালো চাকরি করো।"

"চাকরি!" চমকে উঠল সুভাষ।

"হ্যাঁ, ভারতবাসীর কাম্য সেরা চাকরি।"

১৯১৯ সাল।

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আকাশ হঠাৎ অগ্নিবর্ণ হয়ে উঠল।

পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগে ঘটল নৃশংস হত্যাকাণ্ড। অসংখ্য নির্দোষ নিরীহ নরনারী ও শিশু প্রাণ হারাল সৈনিকের গুলিতে।

চারদিকে বিক্ষোভ শুরু হল।

রবীন্দ্রনাথ ব্রিটিশের এই অন্যায় অত্যাচারের প্রতিবাদে ত্যাগ করলেন নাইট উপাধি।

সুভাষের মন দুলে উঠল। এই সময়ে যাবে ইংরেজের অনুগ্রহের চাকরির পরীক্ষা দিতে।

না, না, এ কিছুতেই হতে পারে না।

বেঁকে বসল সুভাষ। কিন্তু আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবরা বলল—"ছিঃ ছিঃ, একি কথা। জীবনের এত বড় একটা সুযোগ নষ্ট করবি?"

সুযোগ! হ্যাঁ, সুযোগই বটে! জীবনের অগ্নিপরীক্ষার সুযোগ।

"হ্যাঁ যাবো আমি বিলেতে।"

গুরুজনদের শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ নিয়ে সুভাষ যাত্রা করল বিলেতে।

"মানুষের মত মানুষ হ বাবা" জননী আশীর্বাদ করলেন।

ঝংকৃত হয়ে উঠল সুভাষের মন।

লণ্ডনে এসে পৌঁছল সুভাষ।

নতুন দেশ, নতুন অনুভূতি। সুভাষের মনে নতুন সংকল্প।

কেমব্রিজে ভরতি হল সুভাষ। থাকবার জায়গাও জুটে গেল ফিটজ উইলিয়ম হলে। ভাগ্য ভাল বলেই জায়গা পেল। নইলে ওখানে জায়গা পাওয়া খুবই কষ্টকর।

আরও আনন্দের কথা, দিলীপকুমার থাকে সেই হলে। পুরনো বন্ধু দিলীপকুমার রায়। ডি. এল. রায়ের ছেলে।

দু' বন্ধুতে গল্প করে। বেড়ায়।

ভারতে অগ্নিযুগের প্রথম অধ্যায় শুরু হয়েছে তখন। তারই কথা আলোচনা করে দু'জনে।

বাংলার দুয়ারে এসেছে নবজাগরণের সাড়া······জ্যোতির্ময় আঘাত হেনেছে রুদ্ধ দুয়ারে।

একদিকে অরবিন্দ, বারীন, উপেন্দ্রনাথ, নিবেদিতা, বিপিনচন্দ্র, সুরেন্দ্রনাথ। অন্যদিকে ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল, সত্যেন আরও কত শত তরুণ······

"আশ্চর্য! যারা আমাদের শত্রু, তাদের দুয়ারেই এসেছি শিক্ষা গ্রহণের জন্য!"

"সত্যি আশ্চর্য! এক হাতে তাদের শৃঙ্খল জড়াচ্ছি অন্য হাতে সেই শৃঙ্খল ভাঙবার সাধনা করছি।"

সময় সময় দু'বন্ধুই আলোচনা করতে করতে চলে যায় অন্য জগতে। ভুলে যায় তারা কোথায় এসেছে, কেন এসেছে।

কিন্তু তাই বলে এত ভাববিহ্বল হলে চলবে না। অমনোযোগী হলে চলবে না।

পড়াশোনায় মন দেয় সুভাষ। মাত্র আট মাস সময়, এর মধ্যেই শেষ করতে হবে কোর্স।

আরো কয়েকজন ভারতীয় বন্ধু জুটে যায় সুভাষের। সবাই সুভাষকে ভালবাসে, মনে মনে শ্রদ্ধাও করে।

আড্ডার অভাব নেই ছাত্রদের মধ্যে। সুভাষকে সেখানে তারা টেনে নিয়ে যেতে চায়। কিন্তু সুভাষ যায় না।

একটি পাঞ্জাবী ছাত্র ছিল বেশী ফূর্তিবাজ। সে মাঝে মাঝেই সুভাষকে এসে বিরক্ত করত। একদিন সুভাষ পড়াশোনা করছে এমন সময় ছেলেটি এসে বলল—"চলো সুভাষ, কি এত পড়াশোনা করছ!"

"কোথায় যাবো?" সুভাষ জিজ্ঞেস করল।

"এখানে কি জায়গার অভাব আছে। কত নাচ গান ফুর্তি···

সুভাষের রক্তচক্ষুর দিকে তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে গেল ছেলেটি। এর পর সুভাষকে কোনদিন আর বিরক্ত করেনি। মুখোমুখি দেখা হবার ভয়ে সে এড়িয়ে এড়িয়ে চলত।

সুভাষ ভারতীয় ছাত্রদের আদর্শ।

দর্শনশাস্ত্রে ট্রাইপোস নিয়ে সগৌরবে পাস করল।

আই. সি. এস. পরীক্ষায় করল চতুর্থ স্থান অধিকার।

বাড়ির লোকেরা খবর পেয়ে আনন্দে অধীর। সুভাষ ফোর্থ হয়েছে। বাড়িতে যেন উৎসবের ঘটা পড়ে গেল। এবার ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে ফিরবে সুভাষ।

ওদিকে বিলেতে বন্ধুবান্ধবদের মধ্যেও শুরু হল আনন্দের

কলরব। "সুভাষ! এবার তুমি তো একটা জাঁদরেল লোক হয়ে গেলে। তোমাকে পায় কে!"

"কেন আমার কি পিঠে পাখা গজাল নাকি?"

"তা নয় তো কি? আই. সি. এস.-এর চাকরি কি সহজ কথা?"

"আমি যদি চাকরি ছেড়ে দি?"

"যাও, ইয়ারকি করো না।"

"ইয়ারকি নয়, সত্যি কথা।"

বন্ধুরা স্তব্ধ হয়ে সুভাষের মুখের দিকে তাকাল। সে মুখে কোন কৌতুক বা সন্দেহের ছাপ নেই। দৃঢ় প্রত্যয়ের ভাব সুভাষের চোখে মুখে।

অবাক্ হয়ে তারা জিজ্ঞেস করল—"তাহলে কি করবে?"

সুভাষ দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দিল—"দেশের কাজ করব।"

"দেশের কাজ? কেন, আই. সি. এস. হয়ে কি দেশের কাজ করা যায় না? রমেশচন্দ্র দত্ত কি আই. সি. এস. হয়ে দেশের কাজ করেন নি!"

"দু' নৌকায় পা দিয়ে আমি কাজ করতে পারব না ভাই। ইংরেজের কৃপার অনুগ্রাহী হয়ে ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়াই করব, এটা কেমন কথা?"

"ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়াই?"

"হ্যাঁ। দেশসেবা করা মানেই দেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করা। আর সেই যুদ্ধ ইংরেজের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ।"

কেঁপে উঠল যেন মাটি। বিস্ময়ে স্তব্ধ সুভাষের বন্ধুর দল।

"এই কি তোমার সংকল্প?"

"হ্যাঁ।"

"বাড়ির লোককে জানিয়েছ?"

"জানাইনি। জানাব। আমি এখানেই চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে চলে যাবো।"

"সে কি! এমন কাজ কি কখনো করতে আছে? এখানে চাকরি ছেড়ে দিলে নিজের খরচায় ভারতে ফিরতে হবে যে। তার চেয়ে দেশে চলে যাও এখানকার খরচায়। পরে যদি সত্যি ছাড়তে হয়, বিবেচনা করে ছেড়ে দিও।"

"না। কোন কিছুর জন্যই আমি প্রতারণার আশ্রয় নিতে চাই না। যা করব মনে প্রাণেই করব।"

বিলেতের ভারতীয় বন্ধুরা সিদ্ধান্ত করেছিল, সুভাষকে সংবর্ধনা জানাবে। সব কিছু ভণ্ডুল হয়ে গেল। সুভাষ মন স্থির করে ফেলেছে সে পদত্যাগ করবে। বাড়িতে চিঠি লেখা হয়ে গেছে পর্যন্ত।

বন্ধুর দল এসে অনুরোধ করল আবার।

"সুভাষ, এ চাকরি ছেড়ো না। আই. সি. এস. চাকরি ছাড়া মানেই স্বর্গ থেকে নির্বাসন, সে কথা বোঝো তো?"

"বুঝি। কিন্তু আর সময় নেই। আমার সব আয়োজন সম্পূর্ণ।"

"সে কি!"

"হ্যাঁ।"

"বাড়ির লোককেও জানিয়ে দিয়েছ?"

"হ্যাঁ।"

"তাঁরা জবাব দিয়েছেন কিছু?"

"দিয়েছেন। সবাই মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছেন।"

"হবেনই তো।"

"কিন্তু জানো। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন আমার এই সিদ্ধান্ত জেনে খুশী হয়েছেন। তিনি আশীর্বাদ করেছেন আমাকে।"

"সত্যি?"

"হ্যাঁ। আমার মনেও কত আনন্দ হচ্ছে। গান্ধীজী ভারতে আন্দোলন শুরু করেছেন, আমিও যোগ দেব সেই আন্দোলনে।"

বলতে বলতে সুভাষের চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

কারুর কথা শুনল না, কোন বাধা মানল না, সুভাষ আই. সি. এস. চাকরিতে ইস্তফা দিল।

জাহাজে করে রওনা হল ভারতে।

॥ ৭ ॥

বোম্বাইয়ের উপকূলে এসে ভিড়ল জাহাজ।

এবার সুভাষচন্দ্র নতুন মানুষ। নতুন মন্ত্রে দীক্ষিত নতুন আকাঙ্ক্ষায় উজ্জীবিত।

ত্যাগব্রতী—দেশহিতব্রতী সুভাষচন্দ্র।

বোম্বাই থেকে এবার সুভাষচন্দ্র ট্রেনে যাবেন কলকাতা। মা বাবা দাদা সবাই সেখানে অপেক্ষা করছেন তাঁর জন্য। সবাই যেন আকর্ষণ করছে তাঁকে।

কিন্তু দুর্বার নিয়তি। বোম্বাইতে নেমেই তিনি সোজাসুজি চলে গেলেন মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে দেখা করতে।

গান্ধীজীকে প্রণাম করে বললেন—"আমি সুভাষচন্দ্র বোস। বিলেত থেকে এইমাত্র ফিরে এলাম।"

"তুমিই আই. সি. এস. ত্যাগ করে চলে এসেছ?"

"হ্যাঁ।"

"কেন?"

"আমি দেশের কাজ করতে চাই। আমি আপনার আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করতে চাই?"

"বেশ, খুব ভালো কথা। আমি তোমাকে আশীর্বাদ করছি।"

"কিন্তু আমি আপনাকে কয়েকটি কথা জিজ্ঞেস করতে চাই।"

"বেশ, বলো।"

"আপনি কি মনে করেন, শক্তিশালী ইংরেজ জাতের হাত থেকে অহিংস আন্দোলন দিয়ে আমাদের স্বাধীনতা কেড়ে আনবেন?"

গান্ধীজী মৃদু হাসলেন। বললেন—"ইংরেজের সঙ্গে লড়াই করার

মত অত অস্ত্র আমাদের নেই। তাই অহিংসাই আমাদের একমাত্র অস্ত্র। মনের অস্ত্র।"

"আমার মনে হয় এই অহিংস অস্ত্রের ভয়ে দুর্ধর্ষ ইংরেজ এই সোনার রাজ্য ফেলে পালাবে না।"

গান্ধীজী বুঝলেন সুভাষের মনে সংশয় রয়েছে। সে নির্ভীক, সে দেশপ্রেমিক। কিন্তু সে স্পষ্ট নির্দেশ চায়।

বললেন গান্ধীজী—"তুমি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের কাছে যাও। তিনি তোমাকে নির্দেশ দেবেন।"

সুভাষচন্দ্র কলকাতায় পৌঁছে নিজের বাড়ির দিকে গেলেন না। সোজাসুজি চিত্তরঞ্জনের বাড়ি গিয়ে হাজির হলেন।

"আমি এসেছি আপনার কাছে। আমাকে পথ-নির্দেশ দিন।"

প্রণাম করতে গেলেন সুভাষ। চিত্তরঞ্জন তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। ছুটে এলেন বাসন্তী দেবী।

"সুভাষ এসেছ?" তিনিও পুত্রস্নেহে জড়িয়ে ধরলেন সুভাষকে। সুভাষ তাঁকেও প্রণাম করলেন।

"আই. সি. এস. টা ছেড়ে দিয়ে এলে?" বললেন চিত্তরঞ্জন।

"হ্যাঁ। ভেবে দেখলাম গোলামি করা আর দেশসেবা করা এক সঙ্গে চলে না।"

"এবার কি করতে চাও?"

"দেশের কাজ করব। আপনি আমার গুরু। আশীর্বাদ করুন। কাজের নির্দেশ দিন আমাকে।"

"তোমার মত লোকই আমি খুঁজছিলাম। তোমাকে পেয়ে আমার ভালই হল। কাজের নির্দেশ নিশ্চয়ই দেব।"

একটু সংকোচ—একটু দ্বিধা—কিন্তু অন্তরে নির্ভীক সুভাষচন্দ্র। স্বেচ্ছায় সিংহাসন ত্যাগ করে চলে এল যে সম্রাট্—জয়ের গৌরবে তবু সে উদ্ভাসিত।

বাড়ির সবাই কমবেশী ক্ষুব্ধ। কিন্তু ক্ষুব্ধ হননি শুধু মেজদা শরৎচন্দ্র। বললেন—"গোলামি করবার ছেলে সুভাষ নয়।"

দেশবন্ধু দিলেন কাজের নির্দেশ।

প্রথমে বিলিতি বর্জন।

যে চিত্তরঞ্জন নিজের জামাকাপড় ধোলাই করে আনতেন বিদেশ থেকে তিনি গায়ে তুলে নিয়েছেন মোটা খদ্দরের ধুতি পাঞ্জাবি। বাসন্তী দেবীও খদ্দরের মোটা শাড়ী পরছেন।

সুভাষচন্দ্র বললেন—"আগে নিজের বাড়িতেই বিলিতি বর্জন শুরু হোক্।"

"বেশ, তাই করো। এই তো প্রকৃত আদর্শ।"

সুভাষচন্দ্র দামী পোশাক ছেড়ে পরলেন মোটা খদ্দর। রাজা হলেন সন্ন্যাসী।

এবার বিলিতি বস্ত্রের বহ্ন্যুৎসব।

১৯২১ সাল।

দেশবন্ধুর বাড়ির সামনে বাড়ির লোকের যার যত বিদেশী বস্ত্র ছিল সব জড়ো করা হল। দেশবন্ধু নিজের দামী সুটগুলি নিজের হাতেই এনে জড়ো করলেন সেখানে। বললেন—"সুভাষ, এবার আগুন জ্বালাও।"

সুভাষচন্দ্র আগুন ধরিয়ে দিলেন সেই বিদেশী বস্ত্রের বিরাট স্তূপে।

শুরু হল বিদেশী বস্ত্রের অগ্নি-যজ্ঞ। পথে পথে পল্লীতে পল্লীতে।

॥ ৮ ॥

নতুন প্রাণের বন্যা এসেছে যেন দেশে।

এসেছে মানুষের ভেতর নতুন অনুভূতি। জেগেছে প্রাণের নতুন স্পন্দন।

নভেম্বর মাসে ইংলণ্ডের যুবরাজ এলেন ভারত পরিদর্শনে। সরকার পক্ষ থেকে বিপুল সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়েছে। কিন্তু কংগ্রেস নির্দেশ দিল—সংবর্ধনা উৎসব বর্জন করতে হবে। সারা দেশব্যাপী হবে হরতাল।

যুবরাজ দিল্লীতে এলেন। কিন্তু একি চেহারা নগরীর! পথে লোকজন নেই, গাড়িঘোড়া চলছে না, দোকানপাট বন্ধ।

কলকাতারও সেই অবস্থা। ট্রাম বাস ট্যাক্সি—কোন যানবাহনই নেই পথে। কলকাতা শহরের পথঘাট জনশূন্য—শ্মশান।

এই হরতাল পরিচালনা করলেন সুভাষ। সাফল্যের সমস্ত কৃতিত্ব তাঁরই।

স্টেশন থেকে গাড়ি করে স্ত্রীলোক ও শিশুদের গন্তব্য স্থানে পৌঁছে দেবার ভার নিয়েছিলেন সুভাষচন্দ্র। সেই গাড়িতে লেখা ছিল On Nation's Service—অর্থাৎ জাতীয় সেবাব্রতে। সেদিন অন্য কোন যানবাহন চলেনি।

ইংরেজ সরকার ভয়ানক খেপে গেল। তার ফলে বেআইনী হয়ে গেল কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী।

কংগ্রেস থেকে বলা হল—এ ঘোষণা আমরা মানব না। সুভাষচন্দ্রও করলেন তার প্রতিধ্বনি—"আমরা মানব না এ অন্যায় নীতি। প্রতিবাদ করব, এ আইন ভাঙব।"

স্থির হল, স্বেচ্ছাসেবকরা পাঁচজন করে দলবেঁধে রাস্তায় রাস্তায় খদ্দর বিক্রি করবে। দেশবন্ধু প্রচারপত্র ছাপিয়ে দিলেন—'এক লক্ষ স্বেচ্ছাসেবক চাই।'

দলে দলে লোক এল স্বেচ্ছাসেবক দলে নাম লেখাতে। পাঁচজন করে এক একটি দল করা হল। এমনি করে তৈরী হল অনেক দল।

প্রথম দল নিয়ে বের হলেন সুভাষচন্দ্র।

দেশবন্ধু তখন তিলক স্বরাজ ভাণ্ডার নিয়ে ব্যতিব্যস্ত। বাংলার বরাদ্দ টাকা তুলবার ভার তাঁর ওপর। কি করে এত টাকা ওঠাবেন সেই চিন্তায় তিনি উদ্বিগ্ন।

এমন সময় ঘটল একটি বিচিত্র ব্যাপার।

বিলেত থেকে ফিরে আসার পর অনেক মেয়ের বাবাই আসছিলেন সুভাষচন্দ্রের হাতে কন্যা সম্প্রদান করতে। কিন্তু সবাই নিরাশ হয়েছিলেন। এবার এলেন এক মেয়ের বাবা সরাসরি দেশবন্ধুর কাছে। তাঁর মেয়েটি এম. এ. পাস। নগদ একলক্ষ টাকা দিতে তিনি রাজী। রাজকন্যা ও সেই সঙ্গে অর্ধেক রাজত্ব।

দেশবন্ধু যেন একটু আশার আলোক দেখতে পেলেন। টেলিফোনে ডাকলেন সুভাষকে। সুভাষ এলেন। তখন খেতে বসছেন দেশবন্ধু, বললেন—"এসো তুমিও বসে যাও।"

খাওয়া-দাওয়ার পরে কথাটা পাড়লেন চিত্তরঞ্জন। বললেন—"তিলক স্বরাজ ভাণ্ডার নিয়ে বড়ই মুশকিলে পড়েছি। কিন্তু এদিকে কখন যে পুলিস আমাদের ধরে নিয়ে যায় তার ঠিক নেই। তার আগে আমার একটা কাজ করে দিতে পারবে?"

সুভাষচন্দ্র বললেন—"আপনার কাজ করতে পারব না, এটা কেমন কথা। বলুন কি কাজ?"

"আমাকে একলক্ষ টাকা যোগাড় করে দিতে হবে।"

"একলক্ষ টাকা! আমার পক্ষে কি করে সম্ভব?"

"খুবই সম্ভব। তুমি একটু রাজী হলেই হয়।"

"আমি রাজী হব না, একথা আপনি ভাবলেন কি করে?"

"তাই তো। আমি কি আর বুঝিনে? তবু একবার জিজ্ঞেস করে জেনে নিলুম। আর কিছু নয়, একটি মেয়েকে শুধু বিয়ে করতে হবে।"

ঘরে একটি বাজ পড়লেও বুঝি এতটা অবাক্ হতেন না সুভাষচন্দ্র। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলেন তিনি। তারপর বললেন—"না না, এ কিছুতেই হয় না। আমি দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছি। এই দেহ প্রাণ কিছুই আমার নয়। যদি আপনি চান লক্ষ টাকা ভিক্ষা করে আমি আপনাকে এনে দেব।"

দেশবন্ধু আর অনুরোধ করতে পারলেন না। নীরবে আশীর্বাদ করলেন সুভাষচন্দ্রকে।

বিকেল বেলায় চিত্তরঞ্জন রসারোডের বাড়িতে চা খাচ্ছেন। কে এসে খবর দিল—"সার্জেণ্ট এসেছে।"

চিত্তরঞ্জন বুঝতে পারলেন সব। তবু নির্বিকার ভাবে বললেন—"ভেতরে আসতে বলো।"

ঘরে এসে ঢুকলেন সার্জেণ্ট নয়—স্বয়ং পুলিস কমিশনার। বললেন—"আপনাকে অ্যারেস্ট করতে এসেছি।"

নির্বিকার ভাবেই জবাব দিলেন চিত্তরঞ্জন—"আমিও প্রস্তুত হয়েই আছি।"

ঠিক সেই সময়ে পুলিস হানা দিল এলগিন রোডের বাড়িতে। সুভাষচন্দ্রও তখন বসেছিলেন চা খেতে। কে এসে খবর দিল—"পুলিস এসেছে।"

সুভাষচন্দ্র বেরিয়ে এলেন। দেখলেন সার্জেণ্ট দাঁড়িয়ে আছে

তাঁর অপেক্ষায়। কাছে আসতেই বলল—"আপনাকে অ্যারেস্ট করতে এসেছি।"

সুভাষ বললেন—"জানি। আমি প্রস্তুত।"

গুরু শিষ্য একসঙ্গেই ধরা পড়লেন। একসঙ্গেই করলেন কারাবরণ। সুভাষচন্দ্রের ছয় মাস জেল হল। চিত্তরঞ্জনেরও হল ছয় মাস।

সুভাষচন্দ্র ভেবেছিলেন আরও বেশী দিনের জেল হবে। অনেকটা উপহাসের ভঙ্গীতেই তিনি বললেন—"আমি কি মুরগী চোর যে এত কম সাজা হল?"

॥ ৭ ॥

অসহযোগ আন্দোলন চলছে তখন পুরোমাত্রায়। বিদেশী দ্রব্য বর্জনের সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী শিক্ষা বর্জনেরও আন্দোলন শুরু হল।

মহাত্মা গান্ধী এলেন কলকাতায়। প্রতিষ্ঠা করলেন এক জাতীয় কলেজ। নাম হল 'গৌড়ীয় সর্ববিদ্যায়তন'।

ছেলেরা গোলামখানা ছেড়ে দিয়ে অলস ভাবে বসে থাকবে না। তারা তাদের জাতীয় কলেজে ঢুকবে। ঢুকবে বিদ্যার মন্দিরে। সেখানে তারা জানবে তাদের ইতিহাস, তাদের সংস্কৃতি। তাদের মনের সম্পদ্ খুঁজে পাবে সেখানে।

কিন্তু এই জাতীয় বিদ্যায়তনের কে নেবে ভার? কে হবে সর্বাধ্যক্ষ?

চিত্তরঞ্জন প্রস্তাব করলেন সুভাষচন্দ্রের নাম। গান্ধীজী বললেন —সুভাষচন্দ্রই যোগ্য লোক। তাই তাঁকেই অধ্যক্ষ নিযুক্ত করা হল।

সরকারী কলেজ ছেড়ে দিয়ে কয়েকজন অধ্যাপকও এলেন। জাতীয় বিদ্যায়তনে পড়বার জন্য বিদেশী স্কুল ছেড়ে দলে দলে ছেলেরাও এসে ভরতি হল।

সুভাষচন্দ্র মনপ্রাণ দিয়ে কলেজটি গড়ে তোলবার চেষ্টা করতে লাগলেন। কঠোর নিয়মানুবর্তিতায় কলেজের সব কাজ পরিচালনা করতে লাগলেন। নিজেও নিয়মিত পড়াতে শুরু করলেন।

কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতে লোকের উৎসাহ কমে গেল। অভিভাবকরা যখন বুঝলেন যে এই কলেজে পাস করলে তাঁদের ছেলেরা সরকারী চাকরি পাবে না, তখন তাঁরা ছেলেদের সেখান থেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

ছেলেরাও ক্রমশঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীর মোহে একে একে জাতীয় কলেজ ত্যাগ করে যেতে লাগল। অধ্যাপকেরাও অল্প মাইনের কাজকে অবহেলা করে অনুপস্থিত হতে লাগলেন।

জাতীয় কলেজ দেখতে দেখতে যেমন ছাত্রতে ভরে উঠেছিল, কয়েক মাস যেতে না যেতে তেমনি আবার খালি হয়ে গেল। কিন্তু সুভাষচন্দ্র নিয়মিত কলেজে আসতে লাগলেন। পড়াবার জন্য নির্দিষ্ট ক্লাসেও যোগদান করতে লাগলেন।

একদিন যথাসময়ে ক্লাসে গিয়ে দেখেন ঘর শূন্য, একটি ছাত্রও নেই। শুধু বেঞ্চগুলি পড়ে আছে।

সুভাষচন্দ্র চুপ করে এক ঘণ্টা সেই ক্লাসে বসে রইলেন। একটি ছাত্রও এল না। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চলে এলেন ক্লাস ছেড়ে।

সুভাষচন্দ্র বুঝলেন, এদেশের লোকেরা প্রাণের আকস্মিক আবেগে যতখানি মেতে ওঠে, ততখানি তাদের ধৈর্য নেই নিষ্ঠার সঙ্গে সেই আদর্শকে ধরে রাখবার। তাই তাদের এত দুর্গতি।

কিন্তু সেজন্য হতাশ হলে চলবে না। ধৈর্য হারালে চলবে না। জাতির প্রাণে নতুন স্পন্দন জাগাতে হবে।

"এক বছরের মধ্যে আমি স্বরাজ এনে দেব।" মহাত্মা গান্ধী বললেন উনিশ শো বিশ সালে। উনিশ শো একুশের ডিসেম্বরও পার হয়ে গেল, তবু স্বরাজের দেখা নেই।

সুভাষের মনে সেই প্রশ্ন। গান্ধীজীর প্রবর্তিত পথে কি স্বরাজ আসবে?

স্বরাজ না এলেও দেশ এগিয়েছে অনেকটা। আন্দোলনের শক্তি ক্রমেই বাড়ছে।

এমন সময় ঘটল চৌরিচৌরার অপ্রত্যাশিত ঘটনা।

উত্তরপ্রদেশের এই গ্রামটির উপর দিয়ে কংগ্রেস দলের এক

শোভাযাত্রা যাচ্ছিল। সে শোভাযাত্রা বাধা দিতে এল একদল পুলিস, কয়েকজন কনস্টেবল ও একজন সাব-ইনস্পেক্টর। জনতা খেপে গিয়ে তাদের আক্রমণ করল। পুলিস দল আশ্রয় নিল থানায়। জনতা থানার চারদিক ঘিরে আগুন ধরিয়ে দিল। পুলিস দলের সবাই পুড়ে মারা গেল।

এই খবর শুনে গান্ধীজী ভয়ানক মর্মাহত হলেন। বারদৌলিতে বসল কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভা। তাতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হল, সারা ভারতবর্ষ থেকে আইন অমান্য আন্দোলন অনির্দিষ্ট কালের জন্য তুলে নেওয়া হোক।

দেশবন্ধু আর সুভাষচন্দ্র তখন জেলে। কংগ্রেসের এই সিদ্ধান্তের খবর পেয়ে দেশবন্ধু ক্ষোভে ও দুঃখে ভেঙে পড়লেন। বললেন—"মহাত্মাজী মস্ত বড় ভুল করলেন। সব কিছু দিলেন বানচাল করে।"

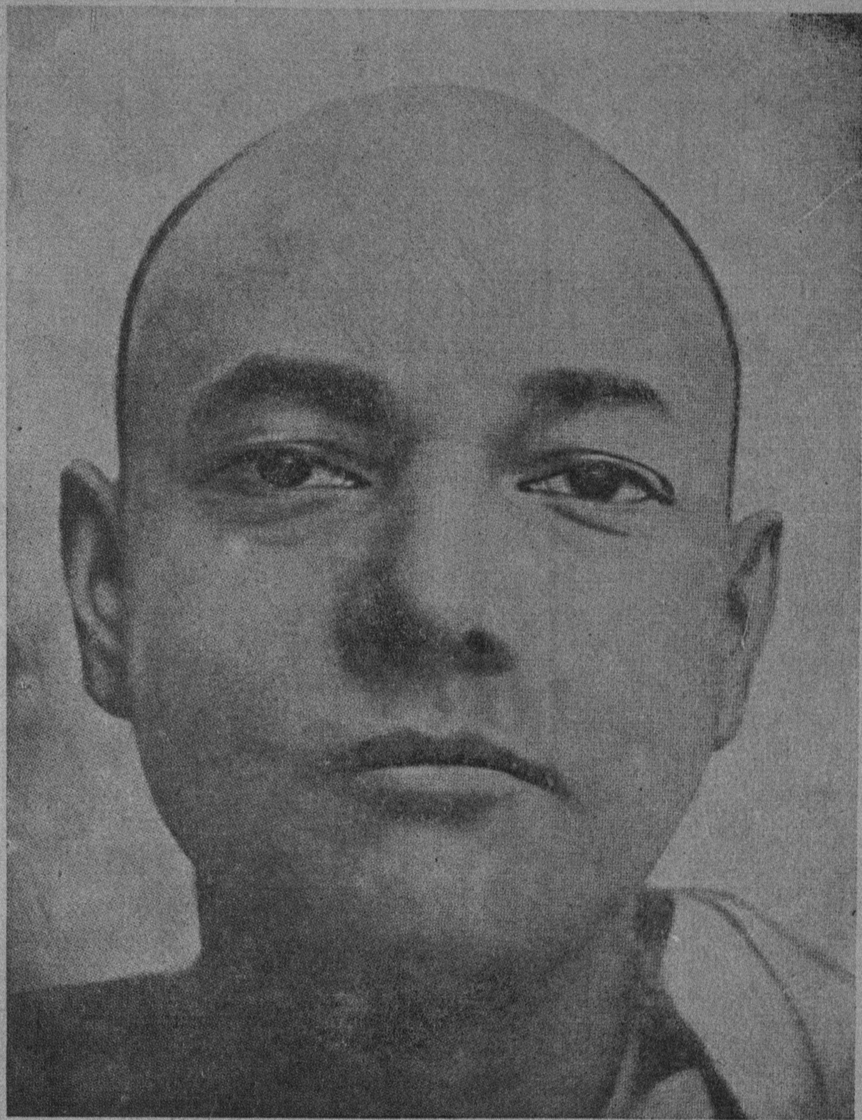
সুভাষচন্দ্রও ক্ষুব্ধ হলেন। বললেন—"চৌরিচৌরার একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনার জন্য সমস্ত দেশকে শাস্তি দেওয়া হবে কেন?"

আবার কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক বসল। বাংলা আর মহারাষ্ট্র গান্ধীজীকে আক্রমণ করল তীব্র ভাষায়। আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেওয়ার মানেই ক্লীবতা। দেশের ক্রমবর্ধমান শক্তিকে খর্ব করা।

ইংরেজ সরকার তবু গান্ধীজীকে রেহাই দিল না। ১৯২২ সালের মার্চ মাসে তিনি গ্রেফতার হলেন।

দেশবন্ধু বললেন—"এবার জেল থেকে বেরিয়ে একটা ইংরেজী দৈনিক কাগজ বের করব। লিখব কংগ্রেসের এই ক্লীবতার বিরুদ্ধে, লিখব সরকারের অন্যায়ের বিরুদ্ধে। কাগজের নাম হবে 'ফরোয়ার্ড'। কি বলো?"

সুভাষ বললেন—"বেশ নাম। ফরোয়ার্ড—এগিয়ে চলা। এগিয়ে আমাদের চলতেই হবে।"



পিতৃশ্রাদ্ধের পর সুভাষচন্দ্র

জেলের মধ্যে মোটামুটি আনন্দেই কাটতে লাগল তাঁদের দিনগুলি। ছ'মাস হাজত ভোগ ও ছ'মাস কারাদণ্ড—মোট আট মাস। তার মধ্যে ছ'মাস সুভাষচন্দ্র ও দেশবন্ধু প্রেসিডেন্সী জেলে পাশাপাশি সেলে ছিলেন। আর আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে ছিলেন একই ঘরে। এই সময়ে গুরুকে সেবা করবার অনেক সুযোগ পেয়েছিলেন শিষ্য।

আলিপুর জেলে শেষ কয়েকমাস দেশবন্ধুর একবেলার রান্নাও সুভাষকে করতে হতো।

কোন রাজনৈতিক নেতা দেশবন্ধুকে রসিকতা করে বলেছিলেন—"আপনি সুভাষের মত একজন 'কুক' পেয়েছিলেন, আপনি তো ভাগ্যবান।"

দেশবন্ধু বলেছিলেন—"সুভাষ এত ভাল রাঁধতে পারে আর এত ভাল সেবাযত্ন করতে পারে তা সত্যি আমার জানা ছিল না।"

দেশের সেবা করা যার ব্রত সে সেবাযত্ন জানবে না তো কে জানবে?

জেল থেকে বেরোবার পর সুভাষের ডাক পড়ল সেই সেবার কাজেই।

উত্তরবঙ্গে ভয়ানক বন্যা হয়েছে। পাঁচ-পাঁচটি জেলা গিয়েছে ভেসে। তখনও জল দাঁড়িয়ে আছে দশ বারো ফুট উঁচু হয়ে। ঘরবাড়ি অনেক নিশ্চিহ্ন। গরু বাছুর, মানুষ বহু মৃত ও গৃহহীন।

কংগ্রেস থেকে ত্রাণ ও সাহায্যের ব্যবস্থা করা হল। সঙ্গে পাঠিয়ে দেওয়া হল সুভাষকে এবং একজন ডাক্তারকেও। ডাক্তার জে. এম. দাশগুপ্ত।

সেবাত্রাণের ব্রত নিয়ে সুভাষচন্দ্র ঘুরতে লাগলেন উত্তরবঙ্গ—আদমদিঘি, মদনপুর, কুশুম্বি, বগুড়া। বিপন্নদের সাময়িক আশ্রয়ের

জন্য এখানে ওখানে গড়ে তুললেন অসংখ্য তাঁবু। সেখানে খাদ্য ও বস্ত্র পাঠাতে লাগলেন।

ওদিকে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ত্রাণভাণ্ডারে অর্থসঞ্চয়ের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করতে লাগলেন। তাঁর আবেদনে চাঁদা উঠল চার লক্ষ টাকা। শুধু টাকা নয়, খাদ্য, বস্ত্র এবং ওষুধপত্রও প্রচুর আসতে লাগল।

কিন্তু কী আশ্চর্য! সরকার তখন নীরব। প্রজা বানের জলে ভেসে যাচ্ছে আর রাজা আছেন নিশ্চিন্তে বসে। ভারতবাসী দেশকে স্বাধীন করার আন্দোলন করছে বলেই কি এই আক্রোশ!

কংগ্রেসের ত্রাণ ও সেবার কাজ বিরাটভাবে সফল হল। দেশবাসীর কাছে বেড়ে গেল কংগ্রেসের মর্যাদা। কংগ্রেসই অনুভব করে নির্যাতিত মানুষের দুঃখ......কংগ্রেসই ভারতীয় জনসাধারণের একমাত্র প্রতিনিধি হবার দাবি করতে পারে।

দেশবন্ধু জেল থেকে ছাড়া পেলেন সুভাষচন্দ্রের ছাড়া পাওয়ার চার পাঁচ দিন পরে।

এবার কি ?

দেখতে দেখতে এসে গেল উনিশশো বাইশ সালের ডিসেম্বর মাস। গয়াতে বসবে কংগ্রেসের অধিবেশন।

চিত্তরঞ্জন বললেন—"সুভাষ, চলো গয়াতে।"

"চলুন।"

গয়া-কংগ্রেসে দেশবন্ধুর ভাষণ হল অপূর্ব। কিন্তু তাঁর প্রস্তাব নিয়ে বাধল বিরোধ।

দেশবন্ধু বললেন—"এখন আমাদের একমাত্র পথ কাউন্সিলে ঢুকে সরকারকে আঘাত করা।"

কিন্তু গান্ধীজী সেই প্রস্তাবের বিপক্ষে। গান্ধী-পন্থীরা বললেন—

"নির্বাচিত হয়ে যাঁরা কাউন্সিলে যাবেন তাঁরা কোনকালেই মেজরিটি হবেন না। কাজেই এই পণ্ডশ্রম করে লাভ কি?"

দেশবন্ধু বললেন—"কাউন্সিলে ঢুকে প্রত্যক্ষ কিছু লাভ না হোক পরোক্ষে হবে। মূল উদ্দেশ্য হবে সরকারের অন্যায় কাজের সমালোচনা করা। তাতে আমাদের আন্দোলনের গতি জোরদার হবে।"

গান্ধী-পন্থীরা কিছুতেই সেই যুক্তি মানতে রাজী নন। কাজেই, দলাদলি শুরু হয়ে গেল। সুভাষচন্দ্র রইলেন দেশবন্ধুর দলে।

তাঁর দলে আরও এলেন মতিলাল নেহরু, বিঠলভাই প্যাটেল, হাকিম আজমল খাঁ, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, বীরেন্দ্রনাথ শাসমল এবং আরও অনেক দেশনেতা। তবু ভোটে দেশবন্ধু পরাজিত হলেন।

কংগ্রেসের সভাপতির পদ থেকে চিত্তরঞ্জন সরে দাঁড়ালেন কিন্তু কংগ্রেস ছাড়লেন না। মতিলাল নেহরুও কংগ্রেসের সম্পাদকের পদ ত্যাগ করে তাঁর পাশে এসে দাঁড়ালেন।

চিত্তরঞ্জন সৃষ্টি করলেন নতুন দল—স্বরাজ্য পার্টি।

কলকাতায় ফিরে এলেন চিত্তরঞ্জন। সুভাষকে বললেন—"জয়লাভ আমার একদিন হবেই। কিন্তু প্রচার চাই—প্রচার। দেশের লোককে বোঝাতে হবে।"

সুভাষচন্দ্র বললেন—"আমাদের দেশে পত্রিকাগুলি তো গান্ধীজীরই স্তুতিগান করছে।"

চিত্তরঞ্জন বললেন—"হ্যাঁ। স্বরাজ্য দলকে তারা সহ্য করতে পারছে না। এসো আমরা একটা বাংলা দৈনিক কাগজ বের করি।"

"ইংরেজী দৈনিক কাগজের কথা বলেছিলেন যে?"

"সেটা হবে পরে। এখন দরকার বাংলা কাগজের।"

"সম্পাদক কে হবে?"

"কেন তুমি?"

"আমি পারবো কি ?"

"কেন পারবে না ? তুমিই যোগ্য লোক।"

বের হল দৈনিক বাংলা কাগজ। 'বাংলার কথা'। সম্পাদক সুভাষচন্দ্র।

এবার 'ফরওয়ার্ড'। আরও এগিয়ে চলা।

ইংরেজী দৈনিক 'ফরওয়ার্ড' বের হল। সুভাষচন্দ্র হলেন তার প্রচার সচিব। কাগজের সর্বময় কর্তা হলেন দেশবন্ধু।

দেশবন্ধু বললেন—"সুভাষ, তোমার সমস্ত ক্ষমতা দিয়ে কলকাতাকে গড়ে তোল। কলকাতা উঠলেই বাংলাদেশ উঠবে। তাতেই হবে ভারতের জাগরণ।"

সুভাষচন্দ্র আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলেন 'ফরওয়ার্ড' কাগজটিকে জনপ্রিয় করে তোলবার জন্য। অধ্যাপক বিনয় সরকার তখন ছিলেন সুইজারল্যাণ্ডে। সুভাষচন্দ্র তাঁর কাছে টেলিগ্রাম করলেন।

বিনয় সরকার তো টেলিগ্রাম পেয়ে অবাক্। সুভাষচন্দ্র তাঁকে 'ফরওয়ার্ড'এর 'বিদেশী সংবাদদাতা' হবার জন্য অনুরোধ করেছেন !

সঙ্গে সঙ্গে চিঠিও এসে হাজির হল। সুভাষচন্দ্র তাঁকে অনুরোধ করেছেন ফরাসী, ইতালিয়ান আর জার্মান ভাষায় প্রচারিত বিশ্ব-সংবাদ টেলিগ্রাফ করে 'ফরওয়ার্ড'কে পাঠাতে হবে।

আনন্দের সঙ্গে বিনয় সরকার সেই দায়িত্ব গ্রহণ করলেন।

চিঠিতে লিখলেন সুভাষচন্দ্র—'রয়টারকে হারাতে হবে কিন্তু।'

'ফরওয়ার্ড' কি পিছিয়ে থাকতে পারে ?'

॥ ১০ ॥

শুরু হল বাংলার এক নতুন অধ্যায়।

উনিশশো তেইশ সালে ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল অ্যাক্ট পাস হল। সফল হল স্যার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর অক্লান্ত চেষ্টা। কলকাতা কর্পোরেশনের মাধ্যমে শাসন-পরিচালনা করবার এই প্রথম সুযোগ লাভ করল দেশবাসী।

স্বরাজ্য দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করল। বত্রিশটি ওয়ার্ডে দেশবন্ধুর মনোনীত প্রার্থী কাউন্সিলার নির্বাচিত হলেন। কলকাতা কর্পোরেশনের প্রথম মেয়র নির্বাচিত হলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। ডেপুটি মেয়র সহিদ সুরাবর্দি আর চিফ একজিকিউটিভ অফিসার হলেন সুভাষচন্দ্র বসু।

সুভাষচন্দ্রের বয়স তখন মাত্র সাতাশ। এত অল্প বয়সে এমন একটি গুরুদায়িত্ব পদে সুভাষচন্দ্রই প্রথম বাঙালী। এই পদের বেতন ছিল তখন মাসিক তিন হাজার টাকা। কিন্তু সুভাষচন্দ্র নিতেন অর্ধেক বেতন।

কর্পোরেশনের সে এক গৌরবময় যুগ। কাউন্সিলার, অল্ডারম্যান, মেয়র সবাই খদ্দর পরে অফিসে আসতে লাগলেন। তাই দেখে দেখে কর্মচারীরাও খদ্দর ধরলেন। চেহারা বদল হয়ে গেল পৌরপ্রতিষ্ঠানের।

কর্পোরেশনের অধীনে প্রথমেই একটা শিক্ষা বিভাগ খোলা হল। সারা শহরে স্থাপন করা হল ছেলেমেয়েদের জন্য অনেকগুলো অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়। খোলা হল স্বাস্থ্য-বিভাগ, গরিবরা যাতে বিনামূল্যে চিকিৎসা পেতে পারে তার ব্যবস্থা। শুধু রোগের

প্রতিকার নয়, রোগের প্রাদুর্ভাবের প্রতিষেধক ব্যবস্থাও করা হল। পর্যাপ্ত পরিশ্রুত পানীয় জল সরবরাহ, বস্তি উন্নয়ন প্রভৃতি পরিকল্পনাকে সার্থক করে তোলা হল।

কলকাতা শহর ধারণ করল এক নতুন রূপ। আর এই সব কিছুর পেছনে রইল সুভাষচন্দ্রের কর্মপ্রচেষ্টা।

কিন্তু সুভাষচন্দ্রের এই উচ্চপদ হয়ে উঠল ব্রিটিশ শাসকদের চক্ষুশূল। তাদের সন্দেহ, বিপ্লবী যুবকদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ রয়েছে সুভাষচন্দ্রের।

বিপ্লবীদের কার্যকলাপ তখনও চলছে অব্যাহতভাবে। গোপীনাথ সাহা টেগার্ড সাহেবকে হত্যা করতে গিয়ে হত্যা করলেন আর্নেস্ট ডে-কে। বিচারে ফাঁসি হল গোপীনাথ সাহার।

গোপীনাথের ফাঁসির পর হরিশ পার্কে অনুষ্ঠিত হল এক বিরাট জনসভা। তাতে সুভাষচন্দ্র দৃপ্তকণ্ঠে বললেন—"ব্রিটিশদের বণিক স্বার্থে আঘাত করো, ভাতে মারো তাদের। দু'টি উপায়ে তাদের তাড়ানো যায়, হয় হাতে মেরে, নয় ভাতে মেরে। যেহেতু অস্ত্রশক্তি ভারতবর্ষের নেই, তাই বিকল্প পথই আমাদের বেছে নিতে হবে।"

ফাঁসির পর গোপীনাথের মৃতদেহ আনতে গিয়েছিলেন সুভাষচন্দ্র। কিন্তু মৃতদেহ দেওয়া হল না। নিয়ে এলেন তাঁর একটি কাপড়ের টুকরো। তাই মাথায় করে সগর্বে নিয়ে এলেন সুভাষ।

বিদ্রোহী মাতৃভক্ত সন্তানের শেষ স্মৃতিচিহ্ন।

শাসকগোষ্ঠী খড়্গ-হস্ত হয়ে উঠল সুভাষচন্দ্রের উপর।

উনিশশো চব্বিশ সালের পঁচিশে অক্টোবর। পুলিশ এসে দাঁড়াল এলগিন রোডের বাড়ির সামনে। তাদের হাতে গ্রেফতারী পরোয়ানা।

সুভাষচন্দ্রের গ্রেফতারে সমগ্র দেশে একটা সাড়া পড়ে গেল। দেশবন্ধু তখন ভগ্নস্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য সিমলায় অবস্থান করছেন।

তাঁর কাছে খবর পৌঁছতেই তিনি ক্ষুব্ধকণ্ঠে বললেন—"কী, সুভাষকে গ্রেফতার করেছে? এবার আমি গভর্নমেণ্টকে কাঁপিয়ে ছাড়ব।"

চিত্তরঞ্জন তাড়াতাড়ি চলে এলেন কলকাতায়। কলকাতা কর্পোরেশনের এক সভায় মেয়ররূপে চিত্তরঞ্জন গভর্নমেণ্টের এই কাজের তীব্র নিন্দা করলেন। তিনি বললেন—"স্বদেশকে ভালবাসা যদি অপরাধ হয়, তবে আমিও অপরাধী। যদি সুভাষচন্দ্র অপরাধী হন তবে আমিও অপরাধী—কর্পোরেশনের শুধু প্রধান কর্মসচিব নয়, মেয়রও সমভাবে অপরাধী।"

উনিশশো চব্বিশ সালের পনেরই নভেম্বর প্রথম প্রকাশিত হল 'কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল গেজেট'। এই পত্রিকাটি প্রকাশের পরিকল্পনা করেছিলেন সুভাষ। কিন্তু তা কাজে পরিণত করবার আগেই তাঁকে যেতে হল কারাগারে।

এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় সম্পাদকীয় স্তম্ভে মন্তব্য করা হল—

"প্রধান কর্মসচিবের গ্রেফতারে কর্পোরেশন কতদূর ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, যাহারা ইহার বহির্ভাগে অবস্থিত তাহাদের পক্ষে তাহা পরিমাপ করা দুঃসাধ্য। শ্রীযুক্ত বসু কর্পোরেশনের শুধু কর্মসচিব ছিলেন না; তিনি ছিলেন প্রত্যেক প্রয়োজনীয় কার্যের বা পরিকল্পিত কার্য সম্পাদনের নিয়ন্ত্রণকারী।"

সুভাষচন্দ্রকে প্রথমে রাখা হল আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে। সেখানে বসেই তিনি কর্পোরেশনের কার্য-সংক্রান্ত কাগজপত্র দেখেন, অর্ডার লেখেন। আলোচনা করতে আসেন সেক্রেটারী রামায়া, ইঞ্জিনীয়ার কোটস এবং আরও অনেকে। পরে গভর্নমেণ্ট তাও বন্ধ করে দিলেন। তখন কর্পোরেশন মিঃ জে. সি. মুখার্জীকে তার পরিবর্তে কাজ করবার জন্য সাময়িকভাবে নিযুক্ত করলেন।

সুভাষচন্দ্র কলকাতায় আছেন এটাই হয়তো গভর্নমেণ্টের সহ্য হল না। একমাসের মধ্যেই তাঁকে বদলী করা হল বহরমপুর জেলে।

এবার নিশ্চিন্ত ? না, তবু নিশ্চিত নয় ব্রিটিশ সরকার।

ব্রহ্মদেশের মান্দালয় জেলে তাঁকে নির্বাসনে পাঠানো হল।

দেশবন্ধু উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। যেভাবেই হোক, সুভাষকে ফিরিয়ে আনতে হবে কলকাতায়।

কিন্তু নিজেই অসুস্থ হয়ে পড়লেন। সেই অসুস্থ শরীর নিয়ে গেলেন পাটনা। পাটনা থেকে ফিরেই ফরিদপুর। ফরিদপুর অধিবেশনে সদর্পে ঘোষণা করলেন—"কারারুদ্ধ দেশ-সেবকদের মুক্তি চাই। সুভাষ, সত্যেন আর অনিলবরণ সম্পূর্ণ নির্দোষ। এদের অবিলম্বে ছেড়ে দেওয়া হোক।"

ডাক্তার বলছেন দেশবন্ধুকে বিশ্রাম নেবার জন্য। একবার নয়—বার বার। এতদিন তা অগ্রাহ্য করে এসেছেন দেশবন্ধু। কিন্তু আর পারছেন না। সত্যি বড় অসুস্থ বোধ করছেন তিনি।

এগারোই মে, উনিশশো পঁচিশ। দার্জিলিং চলে গেলেন দেশবন্ধু। ষোলই জুন মঙ্গলবার তিনি মহাপ্রয়াণ করলেন।

যেন বিনামেঘে বজ্রপাত।

মান্দালয়ে কারাপ্রাচীরের অন্তরালে তখন নির্বাসিত সুভাষ। তাঁর গুরু এবং জীবনের পরম হিতৈষীর মৃত্যুতে শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়লেন।

সেই সময়ে লেখা তাঁর একটি চিঠিতে সেই শোক ধ্বনিত হয়ে উঠল—

"তাঁর জীবনের মাত্র তিন বছর কাল আমি তাঁর সঙ্গে ছিলাম এবং অনুচর হয়ে তাঁর কাজ করেছিলাম। এই সময়ের মধ্যে চেষ্টা করলে তাঁর কাছ থেকে অনেক কিছু শিখতে পারতাম। কিন্তু চোখ থাকতে কি আমরা চোখের মূল্য বুঝি ?

"দেশবন্ধুর সঙ্গে আমার শেষ দেখা আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে। আরোগ্য লাভের জন্য এবং বিশ্রাম পাবার ভরসায় তিনি সিমলা

পাহাড়ে গিয়েছিলেন। আমাদের গ্রেফতারের সংবাদ পেয়ে তিনি তৎক্ষণাৎ সিমলা থেকে রওনা হয়ে চলে আসেন কলকাতায়। আমাকে দেখতে তিনি দু'বার আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে আসেন এবং আমাদের শেষ সাক্ষাৎ হয় বহরমপুর জেলে বদলী হবার আগে।

"প্রয়োজনীয় কথাবার্তা শেষ হলে আমি তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে বললাম—আপনার সঙ্গে আমার বোধ হয় অনেক দিন দেখা হবে না।

"তিনি তাঁর স্বাভাবিক প্রফুল্লতা ও উৎসাহের সঙ্গে বললেন—না, আমি শীগগির তোমাদের খালাস করে আনছি।

"হায়! তখন কে জানত যে ইহজীবনে আর তাঁর সাক্ষাৎ পাব না।...তাঁর সেই স্মৃতিটুকু আমার প্রাণের সম্বল হয়ে রয়েছে।

"...জনমণ্ডলীর উপর দেশবন্ধুর অতুলনীয় অলৌকিক প্রভাবের গূঢ় কারণ কি—এ প্রশ্নের সমাধান করবার চেষ্টা অনেকে করেছেন। আমি সর্বপ্রথমে তাঁর প্রভাবের একটি কারণ নির্দেশ করতে চাই। আমি দেখেছি, তিনি সর্বদা মানুষের দোষগুণ বিচার না করে তাকে ভালবাসতে পারতেন।...কত বিভিন্ন রকমের লোক হৃদয়ের টানে কাছে আসত এবং জীবনের কত ক্ষেত্রে এই নিমিত্ত তাঁর প্রভাব ছিল। সমুদ্রে প্রকাণ্ড ঘূর্ণাবর্তের ন্যায় এই বিপুল জনসমাজে তিনি চারদিক থেকে সকল প্রাণকে আকর্ষণ করতেন।"

মান্দালয় জেলে বন্দী সুভাষ।

জানলার ধারে বসে তাকিয়ে থাকেন দূর আকাশ ও বনানীর দিকে। ভাবেন বাংলাদেশের কথা।

দেশবন্ধুর অবর্তমানে নেতৃত্বহীন বাংলা। তবু কত বৈচিত্র্যে ভরা, কত রঙ্গে ভরা সেই বাংলাদেশ।

এগিয়ে এল শরৎকাল। দুর্গাপূজার লগ্ন।

বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় উৎসব এই দুর্গাপূজা। বাঙালীর ছেলে সুভাষের মন চঞ্চল হয়ে উঠল। কারাগারের বন্ধুদের বললেন —"আসুন এবার আমরা জেলের ভেতর দুর্গাপূজো করি।"

উল্লাসে চিৎকার করে উঠল অন্যান্য বন্দীরা। "বাঃ চমৎকার হবে। আনন্দ হবে খুব।"

তখনই পরিকল্পনা স্থির হয়ে গেল। সুপার মেজর ফিগুলের কাছে রাজবন্দীরা আবেদন করল—আমাদের দুর্গাপূজা করতে দেওয়া হোক আর পূজার ব্যয় বাবদ মঞ্জুর করা হোক কিছু টাকা।

ফিগুলে বিচার করে দেখলেন এই আবেদনে অন্যায় কিছু নেই। ভারতীয় জেলখানায় খ্রীস্টান কয়েদীদের ধর্মাচরণ করবার সুযোগ দেওয়া হয়, কাজেই এর বেলায় আপত্তি করবার কোন যুক্তি নেই। দরখাস্ত মঞ্জুর করে ফিগুলে সেটা পাঠিয়ে দিলেন গভর্নমেণ্টের অনুমতি লাভের জন্য।

সুভাষচন্দ্রকে কেন্দ্র করে বন্দীরা পূজার আয়োজনে লেগে গেল। এই প্রথম দুর্গাপূজা হচ্ছে জেলখানায়, কাজেই সবার মনেই বিপুল উৎসাহ।

কিন্তু হঠাৎ এল দুঃসংবাদ। গভর্নমেণ্ট বন্দীদের দরখাস্ত বাতিল করে দিয়েছে।

বন্দীরা দমে গেল। আয়োজন গেল থেমে। গভর্নমেণ্টকে তারা জানিয়ে দিল—"পূজো করতে না দিলে আমরা অনশন করব।"

গভর্নমেণ্ট তবু রাজী হল না।

অনশন চলতে লাগল।

জেল-কর্তৃপক্ষ পালটা ব্যবস্থা নিল! বন্দীদের চিঠি লেখা এবং তার আদানপ্রদান দিল বন্ধ করে।

কলকাতায় তখন 'ফরওয়ার্ড' চলেছে। দেশবন্ধু আর সুভাষচন্দ্রের

অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত সংবাদপত্র। তাতে বেরুল জোরালো খবর। এ নিয়ে জনসাধারণের মনে দেখা দিল বিক্ষোভ।

দিল্লীতে এসেম্বলীর তখন অধিবেশন চলছে। তাতে স্বরাজ্য দলের তুলসীচন্দ্র গোস্বামী মুলতবী প্রস্তাব উত্থাপন করলেন। কেন দেওয়া হবে না মান্দালয় জেলে বন্দীদের দুর্গাপূজার অনুমতি? কোন্ যুক্তিতে?

গভর্নমেণ্ট এর কোন জবাব দিতে পারল না। পূজার দাবি মেনে নিতে হল।

পনেরো দিন পর অনশন ভঙ্গ করল বন্দীরা।

হইচই করে শুরু হল দুর্গাপূজার আয়োজন।

সুভাষচন্দ্র চিঠি লিখলেন বাসন্তী দেবীকে ঃ

"মা, আজ মহাষ্টমী। আজ বাংলার ঘরে ঘরে মা এসে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। সৌভাগ্যক্রমে আজ কারাগারের মধ্যেও তিনি এসে দেখা দিয়েছেন। আমরা এ বছর এখানেই শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা করছি। মা বোধ হয় আমাদের কথা ভোলেননি তাই এখানে এসেও তাঁর পূজার্চনা করা সম্ভবপর হয়েছে। জেলখানার অন্ধকারের মধ্যে, নির্জীবতার মধ্যে পূজার আলো, পূজার আনন্দ বিলীন হয়ে যাবে। এই ভাবে ক'বছর কাটবে জানি না। তবে মা যদি বৎসরান্তে এসে একবার দেখা দিয়ে যান তবে কারাবাস দুর্বিষহ হবে না আশা করি।"

॥ ১১ ॥

বাংলাদেশে ধ্বনি উঠছে—সুভাষ! সুভাষচন্দ্রকে চাই!

কিন্তু সুভাষ মান্দালয়ে মুক্তির প্রহর গুনছেন। কে জানে কবে তাঁর প্রহর গোনা শেষ হবে।

বাংলার কংগ্রেস থেকে হল এক নতুন পরিকল্পনার উদ্ভাবন। সামনেই এগিয়ে আসছে ইলেকশান। তাতে সুভাষচন্দ্র আর সত্যেন মিত্রকে প্রার্থী হিসাবে দাঁড় করান হল। সত্যেনকে দিল্লীতে ভারতীয় এসেম্বলিতে আর সুভাষকে কলকাতায় বাংলার কাউন্সিলে।

ভোটপর্ব সমাধা হল। নির্বাচিত হলেন দু'জনেই। এবার দাবি জানানো হল দেশবাসীর পক্ষ থেকে—সুভাষচন্দ্রকে আমরা প্রতিনিধিরূপে চাই। তাঁকে মুক্তি দেওয়া হোক।

কিন্তু গভর্নমেণ্ট সে দাবি গ্রাহ্য করল না।

ওদিকে শীত যতই বাড়তে লাগল সুভাষচন্দ্রের শরীর ততই খারাপ হতে লাগল। প্রথমে নিমোনিয়া। নিমোনিয়া সেরে গেল। তারপর ঘুষঘুষে জ্বর। জ্বর আর সারে না। শরীরের ওজনও কমে যেতে লাগল।

জেলখানার স্বাস্থ্যপরীক্ষক নির্দেশ দিলেন সুভাষচন্দ্রকে রেঙ্গুনে মেডিকেল বোর্ডের সামনে উপস্থিত হবার জন্য। সুভাষচন্দ্র তাই করলেন। বোর্ড রিপোর্ট দিল, বন্দীকে জেলের ভেতর রাখাটা স্বাস্থ্যসম্মত হবে না।

তবে কি এবার মুক্তি? কিন্তু না। সুভাষচন্দ্রকে পাঠিয়ে দেওয়া হল ইনসিন জেলে।

এপিঠ থেকে ওপিঠ। তবু একটু পরিবর্তন।

ইনসিনের জেল-সুপার একদিন সুভাষচন্দ্রকে দেখে বললেন—"তোমার শরীর তো খুব খারাপ হয়ে গেছে। চেনাই যায় না তোমাকে।"

সুভাষচন্দ্র অবাক্ হয়ে তাকিয়ে দেখলেন—মেজর ফিগুলে।

"তোমাকে এরা এখনো ছাড়েনি ?"

"না।"

"ভেরী লং টাইম। আচ্ছা দেখি আমি কিছু ব্যবস্থা করতে পারি কি না।"

ফিগুলে একটু কড়া ভাবেই লিখলেন গভর্নমেণ্টকে। এই রোগীকে জেলখানায় রাখা শুধু এর পক্ষেই বিপজ্জনক নয়—অন্যান্য বন্দীদের পক্ষেও। এর ভালো চিকিৎসা হতে পারে সুইজারল্যাণ্ডে। গভর্নমেণ্ট জানাল, সুভাষচন্দ্র যদি নিজের খরচে সুইজারল্যাণ্ডে যেতে রাজী থাকেন তবে তাঁকে সেখানে যেতে দেওয়া হবে। তবে সোজাসুজি তাঁকে চলে যেতে হবে রেঙ্গুন থেকে জাহাজে করে। কলকাতায় যেতে দেওয়া হবে না।

সুভাষচন্দ্র কি এতে রাজী হতে পারেন ? কখনো না।

এর পর এল নতুন আদেশ। আলমোরায় স্থানান্তর।

হঠাৎ এবং খুব সংগোপনেই স্থানান্তর করা হল সুভাষকে। রেঙ্গুন থেকে জাহাজে চড়িয়ে তাঁকে নিয়ে আসা হল ডায়মণ্ডহারবারে।

একজন সাহেব অফিসার এসে বললেন—"আপনাকে এখানেই নামতে হবে।"

সুভাষ হতবাক্। "এখানে নামব কেন ?"

অফিসার বললেন—"আপনার জন্য গভর্নর লঞ্চ পাঠিয়ে দিয়েছেন। সেই লঞ্চে নামতে হবে। সেখানে আছেন মেডিকেল বোর্ডের ডাক্তাররা। আপনার স্বাস্থ্য পরীক্ষা হবে।"

সুভাষচন্দ্র নামলেন।

সেই লঞ্চে রয়েছেন নামকরা কয়েকজন ডাক্তার। স্যার নীলরতন সরকার, বিধানচন্দ্র রায়, লেফটেনেণ্ট কর্নেল স্যাণ্ডম আর মেজর হিংসটন।

যথারীতি পরীক্ষা হল। কিন্তু সুভাষকে সেই লঞ্চে অপেক্ষা করতে হল আরও একটি দিন। গভর্নর তখন দার্জিলিং-এ। বোর্ডের মন্তব্য টেলিগ্রাম করে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হল। পরদিন এল তার জবাব।

এমন জবাব সুভাষচন্দ্র প্রত্যাশা করেননি।

তাঁকে মুক্তির আদেশ দিয়েছেন গভর্নর।

মুক্তি!

আড়াই বছরেরও বেশী সময় বন্দী থাকার পর সুভাষচন্দ্র মুক্তি পেলেন উনিশশো সাতাশ সালের ষোলই মে।

॥ ১২ ॥

উনিশশো আটাশের ডিসেম্বরে কলকাতায় বসল জাতীয় মহাসভার অধিবেশন। পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু সভাপতি। আর সুভাষচন্দ্র বিরাট ভলান্টিয়ার বাহিনীর প্রধান অধিনায়ক। জেনারেল অফিসার কম্যাণ্ডিং।

কলকাতা নগরীতে সে কী উদ্দীপনা—সে কি জনস্রোত! কংগ্রেস সভাপতিকে নিয়ে বিরাট শোভাযাত্রা বের হল। এত বড় শোভাযাত্রাকে নিয়ন্ত্রিত করা পুলিসবাহিনীর পক্ষেও হয়তো সম্ভব হত না। সুভাষচন্দ্রের সুপরিচালনায় তা হল সুশৃঙ্খল ও সুন্দর।

শক্তি ও বীর্যের মুর্তিমান প্রতীক সুভাষচন্দ্র।

'ভলান্টিয়ার্স, ফল ইন!' জলদগম্ভীর কণ্ঠে সেই উচ্চারণ সেদিন যে শুনেছে সে ভুলতে পারবে না সুভাষকে। ভুলতে পারবে না কম্যাণ্ডিং অফিসারের পোশাকে কী অপরূপ দেখাচ্ছিল তাঁকে!

বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স। কিন্তু এরা শুধু সেচ্ছাসেবক নয়—এরা সৈনিক। স্বাধীনতা যুদ্ধের ভাবী সৈনিক যে তারা। তারাই তো আনবে স্বাধীনতা।

কিন্তু কংগ্রেস অধিবেশনে যে প্রস্তাব গ্রহণ করা হচ্ছে তা মোটেই সুভাষের মনঃপূত নয়। আমরা চাই স্বাধীনতা, পূর্ণ স্বাধীনতা।

তাই সংশোধনী প্রস্তাব তুললেন সুভাষচন্দ্র। জওহরলাল তাঁকে সমর্থন করলেন। তবু সেই প্রস্তাব পাস হল না।

হবে না তা জানতেন সুভাষ। কিন্তু তাই বলে হতাশ হলে চলবে না। নিজেকে প্রস্তুত করতে হবে। সুযোগ নিশ্চয়ই আসবে একদিন।

অগ্নিযুগের ইতিহাসে রচিত হচ্ছে একটির পর একটি করে অধ্যায়।

লাহোরের ইংরেজ পুলিস ইনস্পেক্টর স্যাণ্ডার্সকে রিভলবারের গুলিতে হত্যা করলো রাজগুরু আর দিল্লীর এসেম্বলিতে বোমা ফাটল। ভগৎসিং আর বটুকেশ্বর দত্তের মুখ থেকে ধ্বনি উঠল "ইনকিলাব জিন্দাবাদ।"

এদিকে যতীন দাস লাহোর জেলে করছেন আমরণ অনশন। ভারতবাসী যেন আজ মৃত্যুভোলা।

তেষট্টি দিন অনশনের পর মারা গেলেন যতীন দাস।

সমস্ত দেশ আলোড়িত হয়ে উঠল সেদিন।

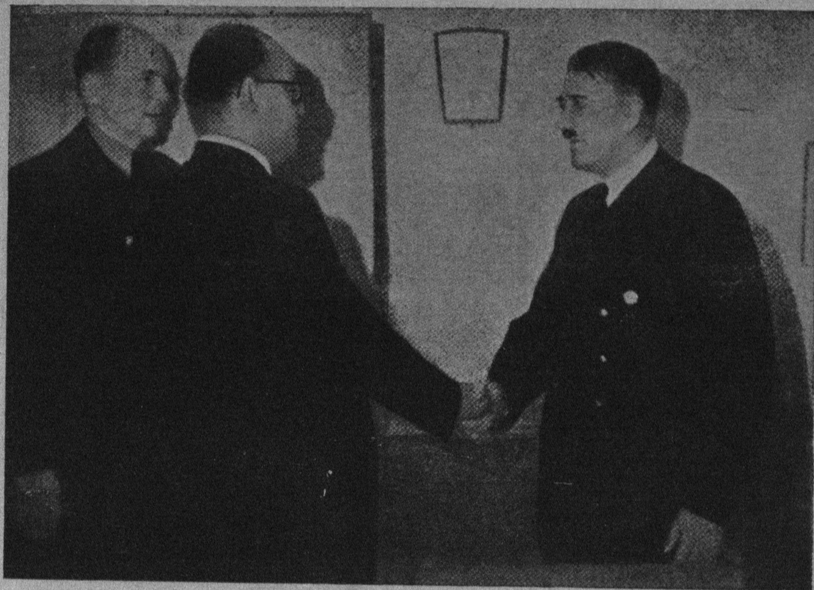
যতীন দাসের মৃতদেহ নিয়ে আসা হল কলকাতায়। বের হল বিরাট শোভাযাত্রা। সেই শোভাযাত্রা পরিচালনা করলেন সুভাষচন্দ্র।

এগারোই আগস্ট কলকাতায় পালিত হল বন্দী-দিবস। বিরাট সভা বসল টাউন হলে। সভাপতি দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন। সভা শুরু হবার আগে হাজরা পার্ক থেকে শোভাযাত্রা বেরুল। শোভাযাত্রার পুরোভাগে রইলেন সুভাষচন্দ্র, কিরণশঙ্কর রায়, সত্য গুপ্ত, সর্দার বলবন্ত সিং। আরো অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি সেই শোভাযাত্রায় যোগদান করলেন।

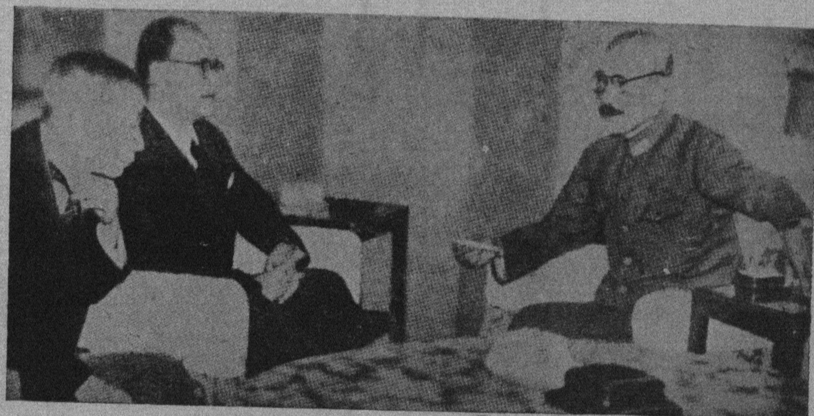
কিন্তু গভর্নমেণ্টের চোখে সেই শোভাযাত্রা বে-আইনী। আলিপুরের স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে নিয়ে যাওয়া হল সমস্ত নেতাদের। অবশ্য ম্যাজিস্ট্রেট জামিনে মুক্তি দিলেন সবাইকে।

এবার লাহোর।

পাঞ্জাব ছাত্র সম্মেলনে সভাপতিত্ব করবার জন্য সুভাষচন্দ্র এলেন লাহোরে।



হিটলার নেতাজীকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন



নেতাজী ও জাপানের প্রধান মন্ত্রী জেনারেল তোজো

ব্রাডল হল-এ বিরাট সভা। সেই সভায় ভিড়ের মাঝে দাঁড়িয়ে আছে অসংখ্য পুলিস।

এই সভায় সংরক্ষিত আসন। প্রবেশপত্র ছাড়া কারুর প্রবেশ করবার অধিকার নেই। তবু এত পুলিস কেন?

সুভাষচন্দ্র তার প্রতিবাদ করলেন। দৃপ্তকণ্ঠে বললেন—"যাঁদের সঙ্গে প্রবেশপত্র নেই তাঁরা দয়া করে সভাস্থল ত্যাগ করুন।"

পুলিসদের আঁতে ঘা লাগলো। কড়া মেজাজে তারা বলল—"আমরা পুলিস।"

সুভাষচন্দ্র বললেন—"পুলিসই হোন আর যেই হোন সংরক্ষিত আসন যে সভায় রয়েছে সে সভায় ঢোকবার অধিকার আপনাদের নেই।"

পুলিসদল মাথা নীচু করে চলে গেল।

সুভাষচন্দ্র পেলেন বিপুল সংবর্ধনা। শুধু লাহোরে নয় জলন্ধর, লুধিয়ানা, মিরাট সব জায়গায়।

মিরাটে তখন ষড়যন্ত্র মামলায় বন্দী বিপ্লবীদের বিচার চলছে। তিনি গেলেন সেই বিপ্লবীদের সঙ্গে দেখা করতে। কিন্তু কোর্টে ঢুকতেই বাধা। পুলিস বলল—"দাঁড়ান আপনাকে সার্চ করব।"

সার্চ! সঙ্গে কোন অস্ত্রশস্ত্র আছে কিনা তাই দেখতে চায় পুলিস। আজকাল যুবকদের উপর তাদের আর বিশ্বাস নেই। বাঙালী যুবকদের উপর তো পুলিসের বিষনজর আরও এককাঠি।

পুলিস অবশ্য সুভাষকে সার্চ করে কিছুই পেল না। এমনকি একটি সিগারেটের বাক্সও নয়। তাই বুঝি হতাশ হয়েই পুলিস ছেড়ে দিল তাঁকে।

ওদিকে কলকাতায় আলিপুর কোর্টে সেই পুরানো মামলাটা ঝুলছে। তাই জরুরী খবর পেয়ে সুভাষচন্দ্র তাড়াতাড়ি ফিরে এলেন কলকাতায়।

এসে দেখলেন বাংলা কংগ্রেস দু'ভাগ হয়ে গেছে। দক্ষিণপন্থী আর বামপন্থী।

বামপন্থীরা সুভাষচন্দ্রকেই নেতা বলে স্বীকার করে নিল। আর দক্ষিণপন্থীদের নেতা হলেন যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত। দক্ষিণপন্থীরা হলেন মহাত্মা গান্ধীর অনুবর্তী, আর বামপন্থীরা কংগ্রেসের সমর্থক হলেও মহাত্মা গান্ধীর নীতির পুরোপুরি সমর্থক নন।

উনিশশো উনত্রিশ সাল।

লাহোরে বসল জাতীয় মহাসভার অধিবেশন। সভাপতি জওহরলাল নেহরু।

সেবারই প্রথম কংগ্রেস ঘোষণা করল পূর্ণ স্বাধীনতার সংকল্প।

কিন্তু সংকল্পই তো সব কিছু নয়। এর আগেও কয়েকবার এমন কথা বলা হয়েছে, কিন্তু কাজ কিছু হয়নি।

সুভাষ চান পালটা সরকার গঠন করতে। যেমন আয়রল্যাণ্ডে সিনফিনেরা গড়ে তুলেছিল।

তাহলে কি বিপ্লব?

কংগ্রেস তা চায় না। মহাত্মা গান্ধী তো চান না মোটেই।

সুভাষচন্দ্রের প্রস্তাব তাই গ্রাহ্য হল না।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি থেকে বাদ পড়ে গেল সুভাষচন্দ্রের নাম। সুভাষচন্দ্র তাঁর দলের বাষট্টি জনকে নিয়ে বেরিয়ে এলেন।

কংগ্রেস ডেমোক্রেটিক পার্টি গঠন করলেন সুভাষ।

ওদিকে বিচার শুরু হয়েছে আলিপুরের স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে। অন্যতম আসামী সুভাষচন্দ্র।

বিচারে সুভাষচন্দ্রের কারাদণ্ড হল এক বছর।

সেদিন ছিল তেইশে জানুয়ারী। সুভাষচন্দ্রের জন্মদিনও সেই তারিখে।

কংগ্রেস সভাপতি জওহরলাল সুভাষচন্দ্রকে অভিনন্দন জানিয়ে টেলিগ্রাম করলেন—"লাহোরে স্বাধীনতার সংকল্প ঘোষণার পর তুমিই প্রথম বলি—আমার অভিনন্দন নাও।"

সুভাষচন্দ্রই প্রথম ধ্বনি তুলেছিলেন—"আমরা চাই স্বাধীনতা।' কলকাতার রাজপথে তাঁর সেই ধ্বনিই প্রতিধ্বনিত হয়েছিল হাজার মানুষের কণ্ঠে! সেই অপরাধেই তিনি হলেন গ্রেফতার।

লাহোরে স্বাধীনতার সংকল্প ঘোষণার পর ভারতবাসীর মধ্যে তিনিই গেলেন প্রথম কারাগারে।

বাংলার আকাশ বাতাস সরগরম হয়ে উঠল।

গান্ধীজী বললেন—'আর দেরি নয়। এবার আমার কাজ শুরু করব। শুরু করব আইন অমান্য আন্দোলন।'

দিকে দিকে আইন ভাঙ্গার আন্দোলনের সাড়া পড়ে গেল।

আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে বন্দী সুভাষ।

দেখতে দেখতে অনেক সত্যাগ্রহী এসে জেলখানা ভরিয়ে তুলল। নেতৃস্থানীয় বন্দীরাও এলেন। দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন, ডাঃ যতীন দাশগুপ্ত, সত্যরঞ্জন বক্সী এবং আরও অনেকে।

ইংরেজ প্রস্তুত হবার সময় পায়নি। ভাবতে পারেনি উনিশশো একুশের আইন অমান্য আন্দোলন আবার উনিশশো ত্রিশে মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে।

সত্যাগ্রহীতে ভরে যেতে লাগল জেলখানা। ইংরেজ তাদের রাজনৈতিক বন্দী বলে স্বীকার করতে চাইল না। চোর আর পকেটমার কয়েদীদের মতই তাদের থাকবার ব্যবস্থা হল।

ইংরেজ অফিসারের পদমর্যাদা পেয়ে জেল-সুপার সোম দত্তের

স্পর্ধার সীমা নেই। সত্যাগ্রহীদের সঙ্গে তিনি নির্বিচারে খারাপ ব্যবহার করতে লাগলেন।

সুভাষচন্দ্র একদিন জেলখানার ভেতরেই ছোট্ট খোলা জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। হঠাৎ তাঁর কানে ভেসে এল আর্ত চিৎকার।

কী ব্যাপার? সুভাষচন্দ্র খবর নিয়ে জানলেন সত্যাগ্রহীদের উপর অত্যাচার করা হচ্ছে। কেন? তারা সাধারণ কয়েদীর মত জাঙ্গিয়া পরতে অস্বীকার করেছে বলে।

সুভাষচন্দ্রকেও তারা সাধারণ কয়েদীর দলে ফেললো। পরদিন সকালে সত্যাগ্রহীদের কয়েকজনকে ঢোকানো হল ম্যাজিস্ট্রেটের সেলে—শাস্তি কামরায়। প্রতিবাদে দলে দলে বন্দীরা ঘরের বাইরে বেরিয়ে পড়তে লাগল। অমনি বেজে উঠল বিপদ-সংকেত—পাগলাঘণ্টি। বাজতে লাগল অবিরাম। প্রহরীরা ছুটে এল। ছুটে এল বন্দুকধারী সেপাই।

পাগলাঘণ্টি বাজলে সব কয়েদীকে ঘরে ঢুকে পড়তে হবে। দরজায় লাগিয়ে দেওয়া হবে তালা। এই হল জেলের আইন।

সুভাষচন্দ্র ঘরে ঢুকতে অস্বীকার করলেন। তাঁর সঙ্গীরাও দাঁড়ালেন বেঁকে। কিছুতেই তাঁরা ঘরে ঢুকবেন না।

এ এক নতুন সত্যাগ্রহ। আইন ভাঙ্গার আন্দোলন। অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ।

সামনে এসে দাঁড়াল বন্দুকধারী সেপাইয়ের দল।

জেলার এলেন। হুকুম করলেন—"কামরায় ঢোক।"

সুভাষ বললেন—"না।"

চিৎকার করতে করতে জেল সুপার সোম দত্ত এসে হাজির হলেন। ক্রোধে ও উত্তেজনায় কাঁপছে তাঁর সর্বাঙ্গ।

সবাই তাকিয়ে আছে সুভাষের দিকে। সুভাষ যা করবেন তারাও তাই করবে। যতীন্দ্রমোহনকে কয়েকজন ওয়ার্ডার ধরে নিয়ে সেলে

ঢুকিয়ে দিল। ডাঃ দাশগুপ্তকেও। নৃপেনবাবুকে ঢুকিয়ে দিল সামনের গোলাঘরে।

সুভাষ ও তাঁর সঙ্গের লোকজনদের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠলেন সোম দত্ত—"জলদি ঢোকাও।"

নড়লেন না সুভাষচন্দ্র। তাঁর সঙ্গীরাও না।

"ঢুকবে না তোমরা ?"

না! না! না!

রাগে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে হুকুম দেন সোম দত্ত—"চালাও গুলি।"

সুভাষচন্দ্র এবার নড়লেন। পিছনের দিকে নয়, সামনের দিকে। এগিয়ে বুকটা টান করে দাঁড়িয়ে বললেন—"করো গুলি।"

পাশের সঙ্গীরা আতঙ্কে চোখ বোজে। এই বুঝি একটা রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটে যায়!

হাবিলদার বন্দুক হাতে সুভাষের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তুলেছে বন্দুক। হঠাৎ কি যেন হয়ে গেল তার। বন্দুক নামিয়ে নিল।

উন্মত্ত দিশেহারা সোম দত্ত বাঁশিতে ফুঁ দিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই আঙিনায় ঢুকে পড়ল আর একদল ওয়ার্ডার। হুংকার দিয়ে বললেন সোম দত্ত—"এদের জোর করে সেলে ঢোকাও।"

আদেশ পাওয়ামাত্র ওয়ার্ডারের দল ঝাঁপিয়ে পড়ল বন্দীদের উপর। হাত পা ধরে সত্য গুপ্তকে ঢুকিয়ে দিল একটা সেলে। পাঁচ-সাতজন ওয়ার্ডার লাঠি নিয়ে এসে সুভাষচন্দ্রকে আক্রমণ করল। সুভাষচন্দ্র লুটিয়ে পড়লেন জ্ঞানহারা হয়ে।

জেল সুপার সোম দত্ত বদলী হলেন। এলেন মেজর পাটনি। সিন্ধু প্রদেশের বাসিন্দা। বিরাট শরীর।

সুভাষের সঙ্গে দেখা করে অনেক কথাবার্তা বললেন, জেলে শান্তি বজায় রাখতে চান তিনি। "আপনার সহযোগিতা পেলে এখানে আর কোন অশান্তি হবে না।"

"শান্তি আমরাও চাই।" বললেন সুভাষচন্দ্র। "তাই বলে কোন অন্যায় মেনে নেব না।"

জেলে আছেন কিরণশঙ্কর রায়। জমিদারের ছেলে। ব্যারিস্টার। কিছুদিন অধ্যাপনাও করেছিলেন। নবীন দেশপ্রেমিক।

সুভাষচন্দ্রের উপর যেমন তাঁর ভালবাসা তেমনি শ্রদ্ধা।

"ওর চেহারা নয়, দেশভক্তি নয়, দুর্লভ বীর্যও নয়। আমাকে টানে ওর চরিত্র। ওর জন্যই জেলখানাও আমার ভালো লাগে।" বললেন কিরণশঙ্কর।

নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী জেলে এসেছেন কিছুদিন আগে; হয়েছেন সুভাষের সঙ্গী। জিজ্ঞেস করলেন কিরণবাবুকে—"কি দেখলেন সুভাষচন্দ্রের চরিত্রে?"

কিরণবাবু বললেন—"ওর সব ছিল। আর কতই না হতে পারত। কিন্তু সব হারিয়ে ও হল সর্বরিক্ত। ওর ঐ রিক্ততা আমাকে টানে। ওকে দেখে নিজের না-পাওয়া আর হারানো সবই ম্লান হয়ে ওঠে। নিজেকে বড় ছোট মনে হয়।"

জেলখানা নয়, যেন বেড়াবার জায়গা। যুবকের দল ঘুরে বেড়ায়, গান-বাজনা করে, হইচই করে দিন কাটায়। বড়রাও যোগ দেন তাদের সঙ্গে। জমে ওঠে তাদের আড্ডা, জমে ওঠে গান-বাজনার আসর। থালা বাটি ওদের তবলা আর চিরুনির দাঁতে সিগারেটের পাতলা কাগজ জড়িয়ে তৈরী হয় বাঁশি।

সুভাষচন্দ্র কিন্তু ভাবেন অন্য কথা। ঐ সব তরুণ যুবক কেউ এসেছে স্কুল ছেড়ে, কেউ এসেছে কলেজ ছেড়ে। তারা এই গড্ডলিকার স্রোতে ভেসে যাবে না তো? তারা কি বেছে নিতে

পারবে সত্যিকার আদর্শ? তারা কি দেশসেবার ব্রতকে জীবনের কর্তব্য হিসাবে আঁকড়ে ধরবে?

সুভাষচন্দ্র নেতৃস্থানীয় বন্দীদের নিয়ে বসে যান আলোচনায়। পূর্ণচন্দ্র দাশ, কিরণশঙ্কর রায় প্রভৃতিকে নিয়ে অনেক পরামর্শ করেন। ছেলেদের জন্য নিয়মিত ক্লাস বসাতে হবে। তাতে পড়াশোনা করবে তারা। সুশৃঙ্খল আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থাও থাকবে। মাঝে মাঝে হবে আলোচনা-সভা আর বিতর্ক-সভা।

এই সব সোনার টুকরো ছেলেরা খাওয়া পায় না ঠিকমত। নিয়মমত কাপড়, জুতো, কম্বলও পায় না। এর ব্যবস্থা করতে হবে।

মেজর পাটনিকে বলা হল এই সব বিষয়। তাঁর সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কোন সুরাহা হল না।

তখন শুরু হল প্রায়োপবেশন। প্রথমে দশজন, তারপর দেখাদেখি অনেক সত্যাগ্রহী অনশনে মৃত্যুর সংকল্প করল।

সুভাষচন্দ্র কি বসে থাকতে পারেন? তিনিও শুরু করলেন একদিন। হইহই পড়ে গেল সারা জেলখানায়।

কত অনুরোধ উপরোধ। কিছুতেই অনশন ভাঙবেন না তিনি।

বাসন্তী দেবী ছুটে এলেন। নিজ হাতে খাইয়ে দিয়ে গেলেন ফলের রস।

এবার স্বস্তি!

ওদিকে কলকাতা কর্পোরেশনে গোলযোগ।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুর পর বাংলার ত্রিমুকুট ধারণ করেছিলেন দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন।

কিন্তু তিনিও অন্তরীণ।

নিয়ম অনুযায়ী তিন মাসের মধ্যে অল্ডারম্যানের বিশ্বস্ততার শপথ গ্রহণ করতে পারলেন না। এখন কি উপায়?

উনিশশো ত্রিশ সালের বাইশে আগস্ট সুভাষচন্দ্রকে কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র নির্বাচিত করা হল।

কিন্তু তিনিও তখন কারাপ্রাচীরের অন্তরালে। সমস্যা এখানেও।

যা হোক সর্বরক্ষা হল। তেইশে সেপ্টেম্বর সুভাষচন্দ্র মুক্তি পেলেন। পরদিনই তিনি অল্ডারম্যানের বিশ্বস্ততার শপথ গ্রহণ করলেন। তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্যে অধিষ্ঠিত হলেন মেয়র-পদে।

উল্লাসের বান ডাকল যেন সারা বাংলায়।

ওদিকে লবণ আইন ভাঙ্গার আন্দোলন স্তিমিত হয়ে আসছে। ধীরে ধীরে প্রশমিত হয়ে আসছে বেগ বন্যা। সত্যাগ্রহীরা বেরিয়ে আসছে জেল থেকে দলে দলে।

কিন্তু ইংরেজের ভয় যায়নি। কংগ্রেসকে কেন্দ্র করে আবার যদি কোন আন্দোলন মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে! তাই কংগ্রেসকে বে-আইনী করে দেওয়া হল।

সুভাষচন্দ্র বললেন—"তাই বলে কি আমরা বসে থাকব? বসে থাকলে কি আমাদের চলে?"

অ্যাকশন কমিটি গঠন করা হল গোপনে। তার সভ্য হলেন পূর্ণ দাশ, যতীন দাশগুপ্ত, রাজেন দেব, কিরণশঙ্কর রায় ও আরও অনেকে। সেই কমিটির হাতে সব কিছু ভার ছেড়ে দিয়ে সুভাষচন্দ্র বেরিয়ে পড়লেন।

প্রথমে গেলেন পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি জেলায় তারপর উত্তর বঙ্গে। বিপুল অভ্যর্থনার সমারোহ সর্বত্র। জনতার কণ্ঠে জয়োল্লাস ও বন্দে মাতরম্ ধ্বনি।

এত কি সহ্য হয় ইংরেজ শাসকের? তাই মালদহে ঢুকতে না ঢুকতেই তাঁর উপর নিষেধাজ্ঞা জারি হয়ে গেল। কিন্তু জনগণ যে তাঁকে আহ্বান করছে—পথে পথে জনস্রোত অপেক্ষা করছে তাঁর জন্য।

নিষেধাজ্ঞা অমান্য করেই ঢুকলেন সুভাষচন্দ্র। অমনি গ্রেফতার করা হল তাঁকে। রেলওয়ে স্টেশনের ওয়েটিং-রুমে হল বিচার।

দৃপ্তকণ্ঠে বললেন সুভাষচন্দ্র—"আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ভারতবাসী হিসাবে আমি এ আদেশ কিছুতেই মেনে নিতে পারি না।"

কোন আবেদনই গ্রাহ্য হল না। বিচারে হল তাঁর এক সপ্তাহ বিনাশ্রম কারাদণ্ড।

উনিশশো একত্রিশ সালের ছাব্বিশে জানুয়ারী।

স্বাধীনতা দিবস—মুক্তিব্রতের সংকল্প গ্রহণের শুভ-লগ্ন।

কিন্তু ইংরেজ সরকার জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দকে কণ্ঠরুদ্ধ করতে বদ্ধপরিকর। তাই তার আগেই কলকাতায় ১৪৪ ধারা জারি হয়ে গেল।

সুভাষচন্দ্র ক্ষুব্ধ। "তাই বলে আমাদের বসে থাকলে চলবে না। আমরা মিছিল বের করব। পালন করব স্বাধীনতা উৎসব।"

পূর্ণ দাস ও কিরণশঙ্কর রায়ের সঙ্গে পরামর্শ ঠিক হয়ে গেল আগের দিন রাত্রেই। পরামর্শটা খুব গোপন রাখা হল। কারণ টের পেলে পুলিস মিছিল বের করতে দেবে না।

কিন্তু টের পেয়ে গেছে পুলিস। সকালেই তারা একদল গিয়ে তাঁর বাড়ির সামনে ঘিরে রেখেছে। কিন্তু কোথায় সুভাষ? তিনি বাড়িতে নেই। এর আগেই তিনি কর্পোরেশন অফিসে গিয়ে বসে আছেন। বোকা বনে গিয়ে চলে এল পুলিস দল।

মিছিল বের হল। অগুনতি মানুষ। সারা কলকাতা শহরের লোক বুঝি ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এসেছে।

এ দৃশ্য ভোলবার নয়। বন্দে মাতরম্ ধ্বনিতে বুঝি আকাশ ফেটে যায়। সুভাষচন্দ্র জনতার পুরোভাগে।

পুলিস এ সহ্য করবে কেন? লাঠি হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। বৃষ্টির ধারার মত লাঠি পড়তে লাগল এদিকেওদিকে।

সুভাষের হাতে জাতীয় পতাকা। একজন সার্জেন্ট ছুটে এল কেড়ে নিতে। সুভাষ কঠিন হাতে সেটি আঁকড়ে রইলেন। ওদিকে পুলিসের লাঠি দমাদম পড়তে লাগল তাঁর পিঠে।

পুলিসের বিক্রম বাড়তে লাগল ক্রমশঃ। তাদের লাঠির ঘায়ে যুবকের দল ঢলে পড়তে লাগল মাটিতে। রাজপথ রক্তে ভেসে গেল।

শুধু পিঠেই নয়, সুভাষের মুখে ও মাথায় পুলিসের লাঠি পড়তে লাগল অজস্র। কী নির্মম! কী নৃশংস!

জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী সহ্য করতে পারলেন না। তিনি আর্তকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলেন—"ওঁকে এমন করে মেরো না। উনি যে কলকাতার মেয়র।"

কিন্তু হিতাহিত জ্ঞানশূন্য তখন পুলিস।

প্রায় অর্ধ অচেতন অবস্থায় পুলিস গ্রেফতার করল সুভাষকে। বিচারে হল ছয়মাস কারাদণ্ড। বিনাশ্রম নয়, সশ্রম।

ইংরেজ সরকার বিচলিত। ভারতের জাগ্রত জনতার উদ্দামতাকে দমিয়ে রাখবার উপায় খুঁজছে প্রতিনিয়ত।

বড়লাট লর্ড আরউইন ডাকলেন গান্ধীজীকে। হল গান্ধী-আরউইন চুক্তি।

সেদিন আটই মার্চ, উনিশশো একত্রিশ। নতুন চুক্তির ফলে দেওয়া হল রাজবন্দীদের মুক্তির আশ্বাস। সুভাষচন্দ্রও মুক্তি পেলেন সেদিন।

রাজবন্দীদের মুক্তির আশ্বাসটাই শুধু লাভ। কিন্তু লোকসানের পাল্লা অনেক ভারী। সত্যাগ্রহ আন্দোলন বন্ধ করে দিতে হল।

আর রাজগুরু, শুকদেব ও ভগৎ সিংহের ফাঁসিকেও রোধ করা গেল না।

মুক্তি পাওয়ার পাঁচদিন পরেই সুভাষচন্দ্র গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করবার জন্য বোম্বে রওনা হয়ে গেলেন।

সবাই ভাবল এবার গান্ধী-সুভাষ বিরোধ বেঁধে উঠবে। লাহোর কংগ্রেসের পর এক বছর কেটে গেল। অথচ পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব রইল শুধু কাগজে কলমেই। সুভাষচন্দ্র যুক্তি দিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু গান্ধীজী তাঁর মতবাদে অটল।

এরপর করাচী কংগ্রেস। জনসাধারণ উদগ্রীব হয়ে রইল। এবার মুখোমুখি শক্তি-পরীক্ষা। সংগ্রামী জনসাধারণের কাছে গান্ধীজীর নীতি যেন ম্লান হয়ে গেল।

তবে সুভাষের সঙ্গে হল গান্ধীজীর আপস রফা। সুভাষ প্রকাশ্য অধিবেশনে আর গান্ধী প্রস্তাবের বিরোধিতা করবেন না। কিন্তু অন্যত্র থাকবে তাঁর মতবাদ প্রকাশের অবাধ অধিকার। কংগ্রেসের ভিতরকার সংকট যাতে ইংরেজদের চোখে ধরা না পড়ে সেজন্যই সুভাষচন্দ্র এই আপসে রাজী হলেন।

জুন মাস, উনিশশো একত্রিশ। বোম্বেতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভা বসছে। সুভাষচন্দ্র গেলেন গান্ধীজীর আমন্ত্রণে। ওয়ার্কিং কমিটির সভ্য হিসাবে যাওয়ার তাঁর আর কোন অধিকার নেই কারণ দু'বছর আগেই তাঁর সেই পদ বাতিল হয়ে গেছে।

সুভাষের সঙ্গে চলেছেন সতীন সেন, শামসুদ্দীন আহমদ এবং আরও কয়েকজন। বোম্বে অধিবেশনে শুধু প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা হবে না, গান্ধী-আরউইন চুক্তির হিসেব-নিকেশও হবে।

বোম্বে পৌঁছে সুভাষ গেলেন সবার আগে গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করতে। কী হৃদ্যতাপূর্ণ আলোচনা! কী মধুর হাস্য-পরিহাস!

দেখে মনেই হয় না এই দু'টি মানুষের মতবাদে রয়েছে কত পার্থক্য, যার জন্য ভারতের অসংখ্য মানুষ কৌতূহলী হয়ে তাকিয়ে আছে এই দু'জনের দিকে।

বোম্বে অধিবেশনে অনেক আলোচনা, অনেক বাদবিতণ্ডার ঝড়। নির্ভীক সুভাষচন্দ্র। গান্ধীজীর স্বর এবার নরম।

গান্ধীজী কি বুঝতে পেরেছেন ভারতের সংগ্রামী জনতা ক্রমশঃ ধৈর্যহীন হয়ে পড়ছে! ক্রমশঃ তারা আস্থাহীন হয়ে পড়ছে তাঁর উপর?

মদনমোহন মালব্য একদিন বলেই ফেললেন "সুভাষ গান্ধীজীকে পুরোপুরি মানে না একথা তো সবাই জানো। কিন্তু কে বা কারা মানে সেই কথাটা আমাকে বলতে পারো?"

অধিবেশন শেষ হয়ে গেল। এবার ফেরার পালা।

কিন্তু সুভাষচন্দ্রকে কাশীতে যেতে হবে। দেশবন্ধুর মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হবে সেখানে।

কাশীর স্টেশনে কী ভিড়। আগেই ওখানকার লোক জেনে গিয়েছিল সুভাষচন্দ্র আসছেন। তাই লোকে লোকারণ্য হয়ে গিয়েছিল স্টেশন ও আশপাশের এলাকা।

দশাশ্বমেধ ঘাটে হয়েছে সভার আয়োজন। সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায় শুরু হবে।

কিন্তু একি! সাড়ে পাঁচটা বেজে গেল তবু সুভাষচন্দ্রের দেখা নেই। যে বাড়িতে এসে উঠেছিলেন, সেখানেও নেই তিনি। কোথায় গেলেন তাহলে?

সভার উদ্যোক্তারা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। সঙ্গী বন্ধুরা বেরিয়ে পড়লেন তাঁকে খুঁজতে।

খুঁজতে খুঁজতে পাওয়া গেল হরিশ্চন্দ্র ঘাটের শ্মশান ধারে।

মড়া পুড়ছে, ধোঁয়ায় ও মড়া পোড়ার গন্ধে ভরে উঠছে চারদিক। সুভাষচন্দ্র বসে আছেন এক সিঁড়ির ধারে। তাঁর পাশে এক উলঙ্গ সাধু। সারা গায়ে ভস্ম মাখা।

সুভাষচন্দ্র জিজ্ঞেস করছেন সাধুকে—"দেশ স্বাধীন হবে কবে?"

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সাধু বললেন—"দের হ্যায়।"

"কত দেরি?"

"বলিদান যব পুরা হোগা।"

কি যেন ভাবতে লাগলেন সুভাষচন্দ্র। বন্ধুর গলার শব্দ পেয়ে চমকে উঠলেন বুঝি। "সভায় যেতে হবে না?"

"হ্যাঁ।" হাতঘড়ি দেখে উঠে পড়লেন সুভাষ।

॥ ১৩ ॥

সাধু বলেছেন সুভাষকে—"বলিদান যব পুরা হোগা।"

বলিদান পূর্ণ হবে কবে?

হিজলী বন্দীশালার ঘটনা কি তারই প্রস্তুতি? সন্তোষ আর তারকেশ্বর সশস্ত্র প্রহরীর গুলিতে মারা গেল।

খবর শুনে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন সুভাষ। অসহ্য! এ কোন্ দেশী বর্বরতা! মাত্র ক'দিন আগে চুক্তি হয়েছে। সই করেছেন গান্ধী আর আরউইন। এর মধ্যেই কি তা ভেস্তে গেল?

"না, এই চুক্তির কোন মূল্য নেই। হিজলীতেই এর সমাধি হয়ে গেছে"—সুভাষচন্দ্র অস্থিরভাবে পায়চারি করতে লাগলেন!

"আমি যাব ওদের মৃতদেহ আনতে। কলকাতায় নিয়ে আসবো।"

মৃত্যুঞ্জয়ীদের পবিত্র দেহের স্পর্শ দিয়ে গণদেবতার প্রাণে শিহরন জাগিয়ে তোলবার সংকল্প নিলেন সুভাষ।

মৃত্যুঞ্জয়ী দুই শহীদের শবাধার কলকাতায় নিয়ে আসা হল। সেদিন কলকাতার সে কী দৃশ্য!

বিরাট মিছিল। সুভাষ নিজের কাঁধে শবাধার বহন করে নিয়ে চলেছেন। শবাধারের উপর পাহাড়ের মত জমে উঠছে ফুল আর ফুলের মালা—মানুষের শ্রদ্ধার অঞ্জলি।

কেওড়াতলা শ্মশানের জ্বলন্ত চিতায় লেখা হয়ে রইল মৃত্যুঞ্জয়ীর অমর ইতিহাস।

কয়েক দিন পর। শোকসভা ও বিক্ষোভ-সভা আহ্বান করা হল মনুমেণ্টের তলায়।

সকালবেলা খবরের কাগজে বিজ্ঞপ্তি দেখে সকলে অবাক্। একই দিনের কাগজে দু'টি বিজ্ঞপ্তি। দু'টি সভা হবে একই জায়গায়। একটির সভাপতি সুভাষচন্দ্র আর একটির সভাপতি যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত। আরও আশ্চর্য, দু'টি সভাই হবে একই উদ্দেশ্যে।

অনেকেই মন্তব্য করতে লাগল—ছিঃ ছিঃ!

তবু কৌতূহলী হয়েই মানুষ অপরাহ্ণে গিয়ে হাজির হল ময়দানে।

কিন্তু কী আশ্চর্য! সেখানে কৌতূহল পরিণত হল বিস্ময়ে—অপার বিস্ময়ে। দু'টি সভা এক হয়ে গেছে। সভাপতি যতীন্দ্রমোহন আর প্রধান বক্তা সুভাষচন্দ্র।

সেনগুপ্তের পাশে সুভাষচন্দ্র! এ দৃশ্য সেদিনের বাংলা দেশে হয়তো কেউ কল্পনা করতে পারেনি। কিন্তু সেদিন কল্পনাও সত্য হল।

বাংলা দেশে যেমন দলাদলি আছে তেমনি প্রয়োজনের সময় তারা দলবদ্ধ হতে জানে।

বিপ্লবের আগুন কি আর নেভে? শুধু বাংলায় নয়, সারা ভারতে জ্বলছে ধিকিধিকি। মেদিনীপুরে পেডি আর বার্জকে হত্যা করা হল। ডালহৌসি স্কোয়ারে ফাটলো বোমা। আত্মাহুতি দিল অনুজা। দীনেশ, বাদল ও বিনয়ের মৃত্যু রচনা করল এক নতুন রক্তরাঙা ইতিহাস!

আর প্রদ্যোত……আরও একটি সংযোজন।

চঞ্চল হয়ে ওঠে সুভাষচন্দ্রের মন। সঙ্গে সঙ্গে জাগে ক্ষোভ আর উত্তেজনা।

অত্যাচারের জাল ছড়িয়ে ফেলছে ইংরেজ সারা দেশে। ঢাকা শহরে তার রূপ নিয়েছে প্রচণ্ড ও জঘন্যতম। শত শত যুবক ও নারী হয়েছে বন্দী ও নিগৃহীত।

নিজের দেশে আমাদের পরবাসী করে রেখেছে ইংরেজ।

স্বাধীনতা চাইবার অধিকার নেই···অন্যায়ের প্রতিকার দাবি করবার অধিকার নেই।···আমাদের ভাগ্যে আছে শুধু প্রহার, নির্যাতন আর মৃত্যু!

"কেন এমন হবে! আমি যাবো ঢাকায়। নিজের চোখে সব দেখবো।" সুভাষচন্দ্র গভীর উদ্বেগের কণ্ঠে বললেন।

বেসরকারী তদন্ত কমিটি গঠিত হল। তার সদস্যরূপে সুভাষ চললেন ঢাকায়।

স্টীমার নারায়ণগঞ্জে ভিড়ল। কিন্তু নামতে না নামতেই একজন পুলিস অফিসার এসে বললেন—"আপনাকে অ্যারেস্ট করলাম।"

সুভাষচন্দ্র হেসে বললেন—"জানতাম এমন হবে।"

পুলিস অফিসারও হেসে বললেন—"চলুন।"

"কোথায়?"

"থানায়।"

থানায় অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর সুভাষচন্দ্রকে নিয়ে আসা হল আবার নদীর ধারে। সেখানে একটি লঞ্চ অপেক্ষা করছিল। পুলিস অফিসার বললেন—"ওতে উঠুন।"

"কোথায় যাবো?"

"যেখানেই যান অন্ততঃ ঢাকায় যেতে পারবেন না।"

"তাহলে গায়ের জোরে আমার ঢাকা যাওয়া বন্ধ করলেন?"

"ক্ষমা করবেন। আমার কোন হাত নেই এতে।"

লঞ্চে উঠলেন সুভাষচন্দ্র। এ যেন দ্বীপান্তর-যাত্রা।

দ্বীপান্তর-যাত্রাই বটে। ঢাকা যাওয়া আর হল না। ঘুরে এলেন চাঁদপুর, কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া—পূর্ব-বাংলার কয়েকটি অঞ্চলে।



জাপানের নৌবাহিনীর অধ্যক্ষ জি. হেন্ত এবং এ. এম. সহায় সহ সাবমেরিনের মধ্যে নেতাজী

॥ ১৪ ॥

মহাত্মা গান্ধী ফিরে এলেন শূন্য হাতে গোলটেবিল বৈঠক থেকে। দেশবাসী অনেক কিছু আশা করেছিল, কিন্তু সবকিছু ব্যর্থ হল।

সুভাষচন্দ্র গেলেন গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করতে। ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকেও যোগদান করলেন।

এবার বৈঠকের আবহাওয়া উষ্ণ—বিক্ষুব্ধ। গোলটেবিল বৈঠকে কোন ফল হয়নি। জাতিকে এবার আহ্বান জানাতে হবে সংগ্রামের জন্য তৈরী হতে।

ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনের গতি-প্রকৃতি নিবিড়ভাবে লক্ষ্য করছিল ইংরেজ। তাই এক সপ্তাহের মধ্যেই কংগ্রেসের অনেক কর্মী ও নেতাকে তারা বন্দী করল। কলকাতায় ফেরার পথে গ্রেফতার হলেন সুভাষচন্দ্র।

সেদিন ছিল উনিশশো বত্রিশ সালের দোশরা জানুয়ারী।

অনেক কাজ পড়ে ছিল কলকাতায়। কিন্তু ফেরা আর হল না। বন্দী রইলেন মধ্যপ্রদেশের সিউনি সাব-জেলে। কয়েকমাস পরে তাঁকে সেখান থেকে জব্বলপুর সেণ্ট্রাল জেলে বদলী করা হল। সেখানে দেখা হল মেজদা শরৎচন্দ্রের সঙ্গে।

এর কিছুদিন আগে শরৎচন্দ্র গ্রেফতার হন। গ্রেফতার হন।তিনি উনিশশো বত্রিশের ফেব্রুয়ারীর চার তারিখে—আঠারোশো আঠারো সালের তিন আইন অনুসারে। এই আইনের বলে পুলিস যাকে ইচ্ছা তাকে ধরে কয়েদ করতে পারতো। ইতিপূর্বে শরৎচন্দ্র নিজেই এই আইনের বিরুদ্ধে বহু আন্দোলন করেছেন। এখন ইংরেজ শাসক সেই শয়তানী আইন তাঁর.উপরেই প্রয়োগ করল।

শরৎচন্দ্র একটি মামলা পরিচালনার জন্য ঝরিয়ায় গিয়েছিলেন। সেখানেই তাঁকে গ্রেফতার করা হল। পাঠিয়ে দেওয়া হল জব্বলপুর সেণ্ট্রাল জেলে। কারাকক্ষে মিলন হল দু'ভায়ের।

কিন্তু সেখানকার জেলের আবহাওয়া সুভাষচন্দ্রের সহ্য হল না। কিছুদিন যেতে না যেতেই স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ল। তখন তাঁকে পাঠিয়ে দেওয়া হল ভাওয়ালী স্বাস্থ্য-নিবাসে।

কিন্তু সেখানে গিয়েও স্বাস্থ্য ভাল হল না। পেটে একটা জ্বালা অনুভব করতে লাগলেন। হজমশক্তি কমে গেল। জ্বরও হতে লাগল অল্প অল্প।

ভালোভাবে ডাক্তারী পরীক্ষার জন্য তখন সুভাষচন্দ্রকে লক্ষ্ণৌ-এর বলরামপুর হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হল।

বলরামপুর হাসপাতালের ডাক্তাররা সুভাষচন্দ্রকে পরীক্ষা করে যে রিপোর্ট দিলেন তা খুবই উদ্বেগজনক। রোগ সাংঘাতিক। জীবন সংশয়।

মেজবউদি বিভাবতী দেবী ছুটে গেলেন দিল্লী। সরকারী মহলে গিয়ে তদবির করতে লাগলেন। সুভাষচন্দ্র কি মরে যাবে? তার চিকিৎসা হবে না?

কিন্তু এ চিকিৎসা ভারতবর্ষে সম্ভব নয়। যেতে হবে ভিয়েনায়। অনেক তদবিরের পর ভারত সরকার সুভাষকে মুক্তি দিলেন বিদেশ যাওয়ার শর্তে। কিন্তু সেখানে যেতে হবে নিজের খরচে। এ যেন কারাদণ্ডের বদলে নির্বাসন।

'গাঙ্গী' নামক জাহাজে চড়ে সুভাষচন্দ্র রওনা হলেন ইওরোপে। উনিশশো তেত্রিশ সালের পয়লা জানুয়ারী।

আটই মার্চ ভিয়েনায় এসে পৌঁছলেন সুভাষ। জাহাজ থেকে নেমে কিছুটা পথ এলেন ট্রেনে। স্টেশনে গাড়ি ভিড়তেই শোনা গেল 'বন্দে মাতরম্' আর 'ইনক্লাব জিন্দাবাদ'।

ভারতীয় ছাত্রের দল এসেছে সংবর্ধনা জানাতে। স্বদেশের প্রিয় নেতাকে দেখে তাদের কী আনন্দ—কী উৎসাহ!

একটি স্বাস্থ্যনিবাসে এসে উঠলেন সুভাষ। চিকিৎসা চলতে লাগল। চলতে লাগল পরীক্ষার পর পরীক্ষা। ডাক্তাররাও একটু যেন বিব্রত হয়ে পড়লেন।

পাঠানো হল সুইজারল্যাণ্ডে। সেখানে এসে রোগের একটু উপশম হল। ধীরে ধীরে জ্বর সেরে গেল। দেহের ওজনও বাড়ল।

কেটে গেল আরও তিনটি মাস। শরীর তখন মোটামুটি সুস্থ। রোগশয্যায় পড়ে থাকতে আর মন চাইল না সুভাষচন্দ্রের। বেরিয়ে পড়লেন দেশভ্রমণে। গেলেন চেকোস্লোভাকিয়া, পোল্যাণ্ড আর রুমানিয়ায়। তারপর বুলগেরিয়াতেও গেলেন।

পোল্যাণ্ড কিছুকাল আগেও পরাধীন ছিল সম্প্রতি স্বাধীনতা লাভ করেছে। ভারতের মুক্তি আন্দোলনের প্রতি পোল্যাণ্ডবাসীর রয়েছে প্রবল আগ্রহ ও গভীর শ্রদ্ধা। সুভাষচন্দ্র সেখানে যেতেই পেলেন বিপুল সংবর্ধনা।

বুখারেস্টে দেখা হল নরসিংহ মুলগন্ধের সঙ্গে। লেঃ কর্নেল মুলগন্ধ। ভারতীয়, মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ। রুমানিয়ার সামরিক বিভাগের ডাক্তার। রুমানিয়ার একটি মেয়েকে বিয়ে করে সেখানেই সংসার পেতেছেন।

সুভাষচন্দ্র বুখারেস্টে পৌঁছতেই মুলগন্ধ এসে আলাপ করলেন। ভারী হাসিখুশী আর অমায়িক লোক। যৌবনে দেশ ছাড়া হলেও ভারতকে ভোলেননি। নিয়মিত গীতা পড়েন। বুখারেস্টে যে ক'দিন ছিলেন মুলগন্ধের গৃহেই ছিলেন সুভাষচন্দ্র।

আবার ভিয়েনায় ফিরে এলেন সুভাষচন্দ্র। সেখানে আগেই বিঠলভাই প্যাটেলের সঙ্গে তাঁর আলাপ ও ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল।

এবার এসে দেখলেন বিঠলভাই অসুস্থ, ঘনিষ্ঠতা আরও বাড়ল। সুভাষচন্দ্র শয্যাশায়ী বন্ধুর পাশে থেকে তাঁর সেবা করতে লাগলেন।

অনেক আশা আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্ন ছিল বিঠলভাইয়ের মনে। ভারতবর্ষ স্বাধীন হবে, লুপ্ত গৌরব ফিরে আসবে ভারতবর্ষের। তাই মহাত্মা গান্ধী আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ করেছেন শুনে বিঠলভাই ক্ষুব্ধ হলেন। মহাত্মার সেই কাজের সমালোচনা করে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে দিলেন এক যুক্ত বিবৃতি।

রোগশয্যায় শুয়েও বিঠলভাইয়ের সেই চিন্তা—সেই ধ্যান। বলেন—"সুভাষ, আমার দিন শেষ হয়ে এসেছে, দেশে ফেরা আর আমার হবে না। কিন্তু তুমি তো রইলে।"

সুভাষচন্দ্র বলেন—"না, না, একি কথা বলছেন আপনি! নিশ্চয়ই আপনি ভাল হয়ে উঠবেন।"

বিঠলভাই বললেন—"না। সে আশা নেই। ভারতের জাতীয় আন্দোলনের যে প্রচার কাজ শুরু করেছি তা তুমি সফল করে তোল।"

সত্যই দিন ফুরিয়ে এসেছিল দেশহিতব্রতী বিঠলভাইয়ের। নিষ্ঠুর মৃত্যু তাঁকে ছিনিয়ে নিল সুভাষচন্দ্রের কাছ থেকে। মৃত্যুর আগে বিদেশে ভারতের জাতীয় আন্দোলনের প্রচার কাজ চালাবার জন্য সুভাষচন্দ্রের নামে উইল করে দিয়ে গেলেন একলক্ষ টাকা।

কিন্তু অদৃষ্টের কী পরিহাস! সেই অর্থ সুভাষের হাতে এল না। বিঠলভাইয়ের মৃত্যুর পর তাঁর ভাই বল্লভভাই প্যাটেল আদালতের সাহায্যে সেই উইল বাতিল করে দিলেন।

ব্যথিত নিঃসঙ্গ জীবন।

সুভাষচন্দ্র মনোযোগ দিলেন রচনার কাজে।

মিস এমিলি শেঙ্কল তাঁর সেক্রেটারী। সুভাষচন্দ্র বলে যান আর এমিলি শেঙ্কল টাইপ করে চলেন। অনলস ভাবে চলে হাতের আঙুল।

কিছুদিন পরেই ডাক এল ইংলণ্ড থেকে। সেখানকার ভারতীয়রা এক রাজনৈতিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করবার জন্য সুভাষচন্দ্রকে আমন্ত্রণ জানালেন। কিন্তু অতর্কিতে নিষেধাজ্ঞা জারী হল তাঁর উপর। ইংলণ্ড যেতে পারবেন না সুভাষ।

রাশিয়া এবং আমেরিকা যাওয়াও তাঁর নিষিদ্ধ। চারদিকে নিষেধের বেড়াজাল।

হঠাৎ দেশ থেকে এল নিদারুণ সংবাদ। পিতা জানকীনাথ মৃত্যু-শয্যায়।

চঞ্চল হয়ে উঠল সুভাষের মন। ভারত সরকারের অনুমতি নেবার সময় নেই, জাহাজে গেলেও সময় লেগে যাবে অনেক। তখন অনুমতি ছাড়াই বিমানে করে সুভাষচন্দ্র ভারতবর্ষের দিকে রওনা হলেন।

কিন্তু কী দুর্দৈব! করাচী বিমান বন্দরে পৌঁছেই শুনতে পেলেন তাঁর পিতা আর ইহজগতে নেই। শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে এসে পৌঁছলেন দমদম বিমান বন্দরে।

সেখানেও স্বস্তি নেই। বিমান থেকে নামতেই পুলিস তাঁর উপর জারী করল এক হুকুমনামা। তাতে নানা রকম আজগুবী শর্ত :

এলগিন রোডের বাড়িতে শান্ত শিষ্ট ভাবে থাকতে হবে। বাড়ির লোকজন ছাড়া কারুর সঙ্গে মেলামেশা করা চলবে না। বাড়ি ছেড়ে কোথাও যাওয়া চলবে না। ডাকে পাওয়া চিঠিপত্র, বই বা কোন পার্শেল না খুলে জমা দিতে হবে স্পেশাল ব্রাঞ্চের ডেপুটি সুপারিন্‌টেনডেণ্ট-এর কাছে। সাত দিনের মধ্যেই তাঁকে ভারতবর্ষ ছেড়ে যেতে হবে।

এ যেন এক নয়া অন্তরীণের আদেশ। গৃহে থেকেও বন্দী।

বিক্ষুব্ধ ও শোকসন্তপ্ত মন। বাড়িতে একটা বিষাদময় থমথমে

আবহাওয়া। মা শোকে আকুল। অথচ সাতদিনের বেশী থাকবার উপায় নেই।

কিন্তু মায়ের মন মানে না। বলেন, "তোর বাবার শেষ কাজটা করে যাবি না সুবি ?"

সত্যি তো! পুত্র পারবে না পিতার পারলৌকিক ক্রিয়ায় উপস্থিত থাকতে ? আবেদন করা হল। যদি অনুমতি দেয় ইংরেজ সরকার।

সুমতি হল সরকারের—অনুমতি পাওয়া গেল। কিন্তু কঠোর শর্তে। পিতৃশ্রাদ্ধের কাজ শেষ হতে না হতেই সুভাষচন্দ্র আবার ফিরে চললেন ইওরোপে।

এলেন ভিয়েনায়। রোগ—আবার রোগ দেখা দিয়েছে সুভাষের দেহে। প্রয়োজন অস্ত্রোপচার। ডাক্তার ড্যামিয়েলের তত্ত্বাবধানে সফল অস্ত্রোপচারের পর মুক্তির পথে এগিয়ে চললেন সুভাষ।

এবার বিশ্রাম। কিন্তু শরীরের বিশ্রাম হলেও মনের বিশ্রাম তো নেই। ভারতের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাস রচনা তো শেষ হয়নি।

এ ব্যাপারে মিস এমিলি শেঙ্কলই তাঁর একমাত্র সহায়। আবার ডাক পড়ে তাঁর। আসেন এমিলি। সুন্দরী, তন্বী সুস্মিতা। নিয়ে বসেন টাইপরাইটার।

সুভাষচন্দ্র বলে যান মুখে মুখে আর এমিলির হাত চলতে থাকে টাইপরাইটারের উপর। নিষ্কম্প অবিরাম। সুভাষচন্দ্রের সেক্রেটারী এমিলি শেঙ্কল।

অধ্যায়ের পর অধ্যায় রচনা এগিয়ে চলে—History of the Indian National Movement.

কিন্তু এ কি নোংরামি! পাশ্চাত্যের এক শ্রেণীর লোক কোমর

বেঁধে লেগেছে ভারতকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য। এক জার্মান সাংবাদিক ভারতবর্ষ থেকে ফিরে জঘন্য প্রচারকার্য চালাতে লাগল ভারতের বিরুদ্ধে। খবরের কাগজে নানারকম বিশ্রী ছবি ছাপা হতে লাগল। চলচ্চিত্রও তোলা হল ভারতের নানা কুসংস্কার ও কাল্পনিক জিনিসকে কেন্দ্র করে। 'ইণ্ডিয়া স্পিকস' আর 'বেঙ্গলী' এই দু'টি চলচ্চিত্রে দেখানো হল—ভারতবাসীরা অসভ্য বর্বর। 'এভরিবডি লাভস মিউজিক' নামক ছবিটি আরও এককাঠি উপরে গেল। তাতে দেখানো হল নেংটি-পরা মহাত্মা গান্ধী একটি ইংরেজ রমণীর সঙ্গে নৃত্য করছেন। এই ছবি দেখে পাশ্চাত্যবাসীরা আনন্দ ও কৌতুকে ফেটে পড়ল।

ভিয়েনায় তখন 'বেঙ্গলী' ছবি দেখান হচ্ছিল। সুভাষচন্দ্র ভিয়েনার আর্কবিশপ কর্ডিনাল ইনিট্‌জারের কাছে তীব্র প্রতিবাদ জানালেন। ফলে অচিরেই সেই ছবি দেখানো বন্ধ হয়ে গেল।

উনিশশো পঁয়ত্রিশ খ্রীষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে রোম নগরে অনুষ্ঠিত হল—এশিয়াটিক স্টুডেণ্টস্‌ কনফারেন্স। সুভাষচন্দ্র তাতে আমন্ত্রিত হলেন। এই কনফারেন্সের উদ্বোধন করলেন সিনর মুসোলিনী। দুই মহানায়কের মিলন হল।

আবার কিছুকাল পরেই মিলন হল আর এক মহানায়কের সঙ্গে। ডি. ভ্যালেরা। আয়ার্ল্যাণ্ডের মুক্তিদাতা। বহু বিপ্লবের ঝড় ও বহু রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর তাঁরই নেতৃত্বে দেশ মুক্তি পেয়েছে ব্রিটিশের নাগপাশ থেকে।

ডি. ভ্যালেরা সুভাষকে জানালেন সাদর অভ্যর্থনা।

এরপর মিলন হল এক বিশ্ববিখ্যাত মনীষীর সঙ্গে। উনিশশো ছত্রিশ সালের তেসরা এপ্রিল। সুভাষচন্দ্র সুইজারল্যাণ্ডে গেলেন রোমা রঁলার সঙ্গে দেখা করতে।

প্রথমেই সাদর অভ্যর্থনা জানালেন শ্রীমতী রঁলা। তারপর নিয়ে

গেলেন রোমা রঁলার কাছে। লম্বা ছিপছিপে গড়ন। চেহারায় বার্ধক্য ও পরিণত প্রতিভার ছাপ।

রোমা রঁলা কথা বল্লেন ফরাসী ভাষায়। কিন্তু সুভাষচন্দ্র ফরাসী ভাষা জানেন না। তাই শ্রীমতী রঁলা আর রঁলার বোন দোভাষীর কাজ করলেন।

শুরু হল নানা আলোচনা। ব্যক্তি থেকে দেশ, দেশ থেকে পৃথিবী। ভারতবর্ষ ও গান্ধীর প্রতি প্রবল আকর্ষণ ও শ্রদ্ধা এই বিশ্ববিখ্যাত মনীষীর।

সুভাষচন্দ্র জিজ্ঞেস করলেন—"আপনার কি অভিমত ? গান্ধীবাদের পরিবর্তে অন্য পথে যদি সংগ্রামের মোড় ঘুরে যায়, তাহলে সেটা কি আপনি প্রীতির চোখে দেখবেন না ?"

রঁলা বললেন—"গান্ধীর সত্যাগ্রহ বিফল হলে আমি খুবই দুঃখিত হব। মহাযুদ্ধের পর সকলের মন রক্তক্ষরণ আর হিংসার প্রতি বিমুখ হয়ে উঠেছিল। ঠিক সেই সময়েই গান্ধীর আবির্ভাব হল। রাজনৈতিক সংঘর্ষের ক্ষেত্রে তিনি প্রবর্তন করলেন এক নূতন অস্ত্র।"

সুভাষ বললেন—'কিন্তু ইংরেজের চণ্ডনীতির এক চুলও ব্যতিক্রম হয়নি। হয়তো অসুবিধে একটু হয়েছে কিন্তু তার শাসন চলছে অব্যাহত গতিতে। তাই জাতির আদর্শ আর আকাঙ্ক্ষা যদি ভিন্ন পথে মুক্তিসংগ্রামের পথ খুঁজে নিতে চায় তাহলে সেই সংগ্রাম কি আপনার শুভেচ্ছা থেকে বঞ্চিত হবে ?"

এবার যেন ভাবিত হলেন মনীষী। মনের ভেতর থেকে একটি উত্তেজনাও প্রবল হয়ে উঠল। বললেন—"যে পথেই হোক, সংগ্রাম চালাতে হবে অবিরাম।......"

অনেক বাক্য বিনিময় ও অনেক প্রীতিশ্রদ্ধা বিনিময়ের পর দু'জনের সাক্ষাৎ-পর্ব শেষ হল। সহর্ষ অন্তরে বিদায় নিয়ে এলেন সুভাষচন্দ্র।

এবার দেশে ফেরার জন্য চঞ্চল হয়ে উঠল মন। ভারতের মাটি তাঁকে আকর্ষণ করছে। ভারতের রাজনৈতিক আবর্তে আচ্ছন্ন আকাশ বাতাস হাতছানি দিয়ে ডাকছে তাঁকে।

জওহরলাল তখন ইওরোপ পরিভ্রমণে এসেছিলেন, ফেরবার পথে সুভাষচন্দ্রকে অনুরোধ করে গেলেন তিনি যেন লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসের অধিবেশনের আগেই ভারতে ফিরে যান। আসন্ন লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসের সভাপতি জওহরলাল।

সুভাষচন্দ্রেরও একান্ত ইচ্ছা লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসের আগেই ভারতে ফিরবেন। ভারতবর্ষের সংবাদপত্রেও সেই খবর প্রকাশিত হল।

যাত্রার সমস্ত আয়োজন তৈরী। হঠাৎ ভিয়েনার ব্রিটিশ কনসাল এক পত্র দিলেন,—

'বৈদেশিক বিভাগের মন্ত্রণালয় থেকে আমি আদেশ পেয়েছি আপনাকে এই কথা জানাবার জন্য যে আপনার অভিপ্রেত ভারতে প্রত্যাবর্তনের প্রস্তাব তাঁরা অনুমোদন করেন না। সরকার খুব স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে স্বাধীনভাবে ভারতবর্ষে প্রবেশ করা আপনার পক্ষে সম্ভব হবে না।'

এই পত্র পেয়েও সুভাষচন্দ্র বিচলিত হলেন না। ভারতে প্রত্যাবর্তনই স্থির করলেন।

দেশে ফিরলে যদি তাঁকে কারাগারে যেতে হয় তবু ভালো। সেটা স্বদেশের কারাগার।

ইংরাজ সরকার খবর পেল যে এত সব বাধা নিষেধ সত্ত্বেও সুভাষচন্দ্র ভারতে ফিরছেন। অমনি গুপ্তচররা সক্রিয় হয়ে উঠল। বিমানক্ষেত্রের উপর রাখল তারা সজাগ দৃষ্টি। কিন্তু কোন বিমানক্ষেত্রেই সুভাষচন্দ্রের দেখা মিলল না। সুভাষচন্দ্র তখন ইতালীয়ান জাহাজ 'কমটিভার্ডে'।

জাহাজ বম্বের ঘাটে এসে ভিড়ল উনিশশো ছত্রিশ-এর এগারই

এপ্রিল। আগে থেকেই জনারণ্যে ভরে গেল জাহাজ ঘাটের সারা অঞ্চল। জাহাজ ভিড়তেই মুহূর্মুহুঃ ধ্বনি উঠতে লাগল—'বন্দে মাতরম্' 'সুভাষচন্দ্র বসু কি জয়'।

কিন্তু পুলিস আগে থেকেই প্রস্তুত। কাউকে জেটিতে ঢুকতে দিল না। সুভাষ জাহাজ থেকে নামতেই তাঁর সামনে হাজির করল গ্রেফতারী পরোয়ানা। পুলিসের গাড়িতে গিয়ে উঠলেন সুভাষচন্দ্র।

বিক্ষুব্ধ জনতার কণ্ঠে তখন ধ্বনি উঠছে আরও জোরালো হয়ে—'বন্দে মাতরম্'! "ইনক্লাব জিন্দাবাদ।"

পুনার যারবেদা জেলে বন্দী হলেন সুভাষচন্দ্র।

সারা ভারতে বিদ্যুদ্বেগে ছড়িয়ে পড়ল এই সংবাদ। চঞ্চল হয়ে উঠল আসমুদ্র-হিমাচল। সংবাদপত্রের ছত্রে ছত্রে, জনতার কণ্ঠে কণ্ঠে ধ্বনিত হতে লাগল বিক্ষুব্ধ প্রতিবাদ।

দশই মে নির্ধারিত হল নিখিল ভারত সুভাষ দিবস। সারা দেশ জুড়ে একই দিনে লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে ধ্বনি উঠল—'সুভাষচন্দ্রের মুক্তি চাই।'

সুভাষচন্দ্র ভারতবাসীর এত প্রিয়—সুভাষ দিবসে তার জ্বলন্ত প্রমাণ পাওয়া গেল। তা দেখে ইংরেজ সরকারের অন্তরাত্মাও বুঝি কেঁপে উঠল সেদিন।

দেশবাসী সুভাষচন্দ্রকে দিল শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার উপহার। সেদিন থেকেই তিনি 'দেশগৌরব' খ্যাতিতে ভূষিত হলেন।

একটি জেলে সুভাষচন্দ্রকে বেশী দিন আবদ্ধ রাখতে ভরসা পেল না ইংরেজ সরকার। তাই এক জেল থেকে আর এক জেলে তাঁকে বদলী করতে লাগল।

কিন্তু ক্রমশঃ স্বাস্থ্য খারাপ হতে লাগল সুভাষচন্দ্রের। তখন তাঁর মেজদা শরৎচন্দ্রের কার্শিয়াং-এর বাড়িতে তাঁকে অন্তরীণ করে রাখা হল।

স্বাস্থ্য যখন খুবই খারাপ হয়ে চলেছে তখন ইংরেজ সরকার বোধ হয় তাঁর ঝুঁকি নিতে চাইলেন না। তাই উনিশশো সাঁইত্রিশ সালের সতেরোই মার্চ তারিখে তাঁকে বিনাশর্তে মুক্তি দেওয়া হল।

বাড়ির লোকেরা বললেন—"সুবি, এবার ঘুরে আয় কোন ভালো জায়গা থেকে। শরীরটা বড্ড রোগা হয়ে গেছে।"

কোথায় যাই? ভাবলেন সুভাষ।

অবশেষে ঠিক হল পাঞ্জাবের ডালহৌসি পাহাড়ে যাবেন। জায়গাটা ভালো—স্বাস্থ্যকর।

চলেও গেলেন তাই। স্বাস্থ্য কিছুটা ভালো হওয়ার পর ফিরে এলেন কলকাতায়।

এখন বিশ্রাম দরকার। কিন্তু বিশ্রাম নেবার উপায় কোথায়? দেশবাসীরা তাঁকে ডাকে—তাঁর কথা শুনতে চায়। তাই জনসভায় বক্তৃতা দিতে হয় মাঝে মাঝেই।

ডাক্তারদের অভিমত, সুভাষচন্দ্রের রোগমুক্তি এখনও হয়নি। তাই নভেম্বর মাসে ইওরোপে যাত্রা করলেন।

এবার গেলেন অষ্ট্রিয়ার বাদ্‌গাসস্টাইনে।

নির্জন, নিরিবিলি পরিবেশ।

চিকিৎসা এবং বিশ্রাম দুই-ই চলতে লাগল। আর চলতে লাগল লেখা। আত্মচরিত 'ভারত পথিক'!

এমিলির সঙ্গে আবার দেখা হল। বিদেশে তাঁর সেক্রেটারী এমিলি শেঙ্কল। লেখার সঙ্গিনী।

দেড়মাস বাদ্‌গাসস্টাইনে কাটিয়ে সুভাষচন্দ্র গেলেন লণ্ডনে।

লণ্ডনে যাওয়ার কিছুদিন পরই খবর এল ভারত থেকে—সুভাষচন্দ্র ভারতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নিযুক্ত হয়েছেন।

উনিশশো আটত্রিশ সালে কংগ্রেসের এই অধিবেশন হবে হরিপুরায়। তাই সুভাষচন্দ্র আর বিশেষ বিলম্ব না করে ভারতবর্ষের

দিকে রওনা হলেন। বিমান এসে নামল ভারতের মাটি করাচীতে। সেখানে পেলেন বিপুল সংবর্ধনা। সুভাষচন্দ্রকে দেখবার জন্য সেদিন জনসাধারণের কী আগ্রহ!

নূতন রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র।

কংগ্রেস সভাপতি বা রাষ্ট্রপতি হিসাবে হরিপুরা অধিবেশনে সুভাষচন্দ্র যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তাতে গান্ধীপন্থী অনেক নেতারই মনে দুশ্চিন্তা দেখা দিয়েছিল।

সুভাষচন্দ্রর মুখে একটি মাত্র কথা—মহা সুযোগ জাতির সামনে এগিয়ে আসছে। এর সদ্ব্যবহার করতে হবে। কিন্তু কংগ্রেসের বড় কর্তারা একথায় সায় দিতে চান না। কারণ একথায় সায় দেওয়ার অর্থ সংগ্রাম শুরু করা।

প্রদেশে প্রদেশে দেশীয় মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছে। কাজেই এখন ইংরেজকে ঘাঁটাতে কংগ্রেসের বড় কর্তারা রাজী নন।

সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে মতান্তর বাড়তেই থাকে। শঙ্কিত হয়ে ওঠেন দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিরা। রবীন্দ্রনাথও আর চুপ করে থাকতে পারেন না।

গান্ধীজীকে চিঠি লিখলেন গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ। জওহরলালকে শান্তিনিকেতনে ডাকলেন। তিনি চাইলেন সুভাষের প্রতি গান্ধীজীর মতিগতির পরিবর্তন হোক। অবসান ঘটুক কংগ্রেসের অন্তর্দ্বন্দ্বের।

দেখতে দেখতে বছর ঘুরে গেল। আবার কংগ্রেসের অধিবেশনের দিন ঘনিয়ে এল।

এবার রাষ্ট্রপতি হবে কে? সুভাষ?

না। তা কিছুতেই হতে পারে না। এবার সুভাষ কংগ্রেসের সভাপতি হলে গান্ধী-নীতি বানচাল হয়ে যাবে। এবার একজন বামপন্থীকে সভাপতি করার ইচ্ছা দক্ষিণপন্থীদের মোটেই নেই।

কিন্তু সুভাষচন্দ্রেরই রাষ্ট্রপতি হবার সম্ভাবনা এবার বেশী। ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়াকে দাঁড় করানো হল প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে। মৌলানা আজাদও সরে দাঁড়ালেন। ভোট এখন দু'জনের মধ্যে—ডাঃ সীতারামিয়া ও সুভাষচন্দ্র।

ভোটে জয় হল সুভাষচন্দ্রের। গান্ধীজী খুবই মনঃক্ষুণ্ণ হলেন। তাঁর সব কিছু কল্পনা যেন বানচাল হবার যোগাড় হল। ক্ষুব্ধকণ্ঠে বললেন—"ডাঃ পট্টভির পরাজয় আমার পরাজয়।"

ত্রিপুরী কংগ্রেসের অধিবেশনের দিন ঘনিয়ে এল। কিন্তু রোগাক্রান্ত সুভাষচন্দ্র। ব্রঙ্কো নিমোনিয়ায় শয্যাশায়ী। তাই নিয়েই রওনা হলেন ত্রিপুরী অভিমুখে। গাড়িতে নয়—আম্বুলেন্সে। সঙ্গে মা ও দাদা ডাঃ সুনীল বসু।

নর্মদা নদীর তীরে বনভূমি ত্রিপুরী—সুন্দর মনোরম। জনাকীর্ণ পথ দিয়ে চলে শোভাযাত্রা। বাহান্নটি হস্তিবাহিত সজ্জিত রথের কী অপূর্ব দৃশ্য। রথের উপর রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র নেই—রয়েছে তাঁর প্রতিকৃতি। তিনি চলেছেন অ্যাম্বুলেন্সে।

অধিবেশনের সময় দেহের উত্তাপ ভয়ানক বেড়ে গেল। ডাঃ হেনেসী তাঁকে পরীক্ষা করে বললেন—"আপনার এখনই জব্বলপুর হাসপাতালে যাওয়া উচিত।"

পণ্ডিত জওহরলালও উদ্বেগ প্রকাশ করে সেই পরামর্শ ই দিলেন।

কিন্তু সুভাষচন্দ্র নির্ভীক। দেশের বৃহত্তর স্বার্থের কাছে নিজের স্বার্থ-চিন্তা অতি তুচ্ছ। তাই দৃঢ়কণ্ঠে বললেন—"আমি জব্বলপুর হাসপাতালে যাবার জন্য এখানে আসিনি। অধিবেশন শেষ হবার আগে অন্যত্র যাওয়ার চেয়ে মৃত্যু বরণ করাই আমি শ্রেয় মনে করি।"

অধিবেশনে পড়া হল সুভাষচন্দ্রের লিখিত ভাষণ—"ইংরেজকে এবার চরমপত্র দিতে হবে। আন্তর্জাতিক এই চরম সংকটের মধ্যে

আমাদের শেষ অভিযান শুরু না করলে আর কবে করব? আমি স্থির কঠিন বাস্তবপন্থী। বর্তমান পরিস্থিতির সবটাই আমাদের অনুকূলে। এর পরিপূর্ণ সুযোগ আমাদের নিতে হবে।"

গান্ধীজী ত্রিপুরা অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন না। তবু সুভাষচন্দ্র তাঁর সহযোগিতা কামনা করলেন। অভিভাষণে বললেন—"আমার গুরু দেশবন্ধুর আশীর্বাদে আর মহাত্মা গান্ধীর পরিচালনায় আমাদের সকল সমস্যা দূর হোক—সকল সংকটের অবসান হোক।"

অধিবেশন শেষ হয়ে গেল। সুভাষচন্দ্র ফিরে এলেন কলকাতায়।

কংগ্রেসের ঐক্য বজায় রাখবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি নেই সুভাষের। গান্ধীজীকে অনুরোধ করলেন কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করবার জন্য।

কলকাতার ওয়েলিংটন স্কোয়ারে বসল সভা। বিরাট তার আয়োজন। গান্ধীপ্রমুখ বড় বড় নেতারা সব উপস্থিত।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে চলল আলোচনা। সমাধানের কোন পথই খুঁজে পাওয়া গেল না। সুভাষচন্দ্র দেখলেন দক্ষিণপন্থীদের সঙ্গে কিছুতেই কাজ করা যাবে না মিলেমিশে।

প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির অফিসে বসে লিখলেন পদত্যাগপত্র।

"শেষ চেষ্টা হিসাবে ঘরোয়াভাবে সমস্যার সমাধানের জন্য আমার সাধ্যমত যা করবার আমি তা করেছি।......পরিতাপের বিষয়, দীর্ঘ কয়েক ঘণ্টা আলোচনা করেও আমরা কোনও মীমাংসায় আসতে পারিনি। তাই আপনাদের কাছে গভীর হতাশার সঙ্গে এই কথাই আমাকে বলতে হচ্ছে যে আমি নতুন কমিটি গঠন করতে অসমর্থ হয়েছি।

"বর্তমান অবস্থায় আমার পক্ষে সভাপতির পদ আঁকড়ে থাকা রাষ্ট্রীয় সমিতির পক্ষে বাধা বা বিপত্তির কারণ হতে পারে। আর

কাউকে নতুন করে সভাপতি করলে হয়তো সকল সমস্যার সুমীমাংসা হতে পারে। তাই বিশেষ চিন্তা করে, একান্ত সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে আমার পদত্যাগপত্র আপনাদের কাছে উপস্থাপিত করলাম।"

ওয়েলিংটন স্কোয়ারের সভা শেষ হয়ে গেল। সুভাষচন্দ্র স্বেচ্ছায় যে জয়ের মুকুট ত্যাগ করলেন, তা-ই শিরে ধারণ করে বিজয়ীর আখ্যা নিয়ে ফিরে গেলেন গান্ধীজী।

আর সুভাষচন্দ্র! পরাজয়েও তাঁর গৌরব অম্লান।

নতুন দল গঠন করলেন সুভাষচন্দ্র—ফরওয়ার্ড ব্লক। তাঁর সহায় হলেন আস্‌রফউদ্দিন চৌধুরী, সত্যরঞ্জন বক্সী এবং আরও অনেকে।

বাংলার মানুষ যেন নতুন ভাবে গ্রহণ করল সুভাষচন্দ্রকে। নতুন অনুভূতি, নতুন উদ্দীপনা।

নতুন করে সুভাষ ডাক দিলেন বাংলার মানুষকে।

বাংলার কলঙ্ক হলওয়েল মনুমেণ্ট। কলকাতার ডালহৌসী স্কোয়ারের উত্তর পশ্চিম কোণে এই স্মৃতিস্তম্ভটি সদম্ভে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করছে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলার কলঙ্ক কাহিনী।

"মিথ্যা! মিথ্যা এ কলঙ্ক কাহিনী।" সুভাষচন্দ্র বললেন—"ভারতবাসীকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য ইংরেজ সৃষ্টি করেছে এই কাল্পনিক স্মৃতিস্তম্ভ। এই জাতীয় কলঙ্ককে অপসারণ করতে হবে।"

দলে দলে যুবকের দল ছুটে এল। হাতুরি ও বাটালি নিয়ে ভাঙতে গেল হলওয়েল মনুমেণ্ট।

পুলিস আগেই তৈরী হয়ে ছিল। ধরে ফেলল যুবক দলকে। আবার এল আর একদল যুবক। তারাও ধরা পড়ল পুলিসের হাতে। এল আর এক দল। সুভাষচন্দ্রের ডাকে পাগল হয়ে ছুটে আসতে লাগল মরণভোলা যুবকের দল।

কত আর গ্রেফতার করবে পুলিস? তিতিবিরক্ত হয়ে উঠল তারা।

ইংরেজ সরকার অবশেষে ঐ মিথ্যার স্তম্ভকে রাজপথ থেকে সরিয়ে নিতে বাধ্য হল।

জয় হল সুভাষের।

পুলিস আবার সুযোগ খুঁজছে সুভাষচন্দ্রকে গ্রেফতার করার।

মহম্মদ আলী পার্কে বক্তৃতা দিয়েছেন সুভাষ। তাতে রয়েছে বিপ্লবের ঘোষণা। কাজেই পুলিসকে আর বিশেষ দেরি করতে হল না। দোসরা জুলাই তাঁর বাড়িতে গিয়ে হাজির হল।

জেলে বসে সুভাষ লিখলেন 'ফরওয়ার্ড ব্লক' পত্রিকায় এক অগ্নিঝরা প্রবন্ধ—'হিসাবনিকাশের দিন'। ইংরেজ আরও ছুতো পেয়ে গেল। রাজদ্রোহের অপরাধে অভিযুক্ত করা হল তাঁকে।

লোকটি সত্যি বড় মারাত্মক। জেলখানায় কি কাণ্ডই না বাধিয়ে ফেলল সেদিন। থালা বাটি মগ সব ছুড়ে ফেলতে লাগল। বাঁধানো জায়গায় পড়ে শব্দ হল ঠনঠন। সেপাইটা হকচকিয়ে গিয়ে কিছু বুঝতে না পেরে ছুটে পালাল।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সামনে এসে দাঁড়ালেন জেলার। জিজ্ঞেস করলেন—"কি হয়েছে?"

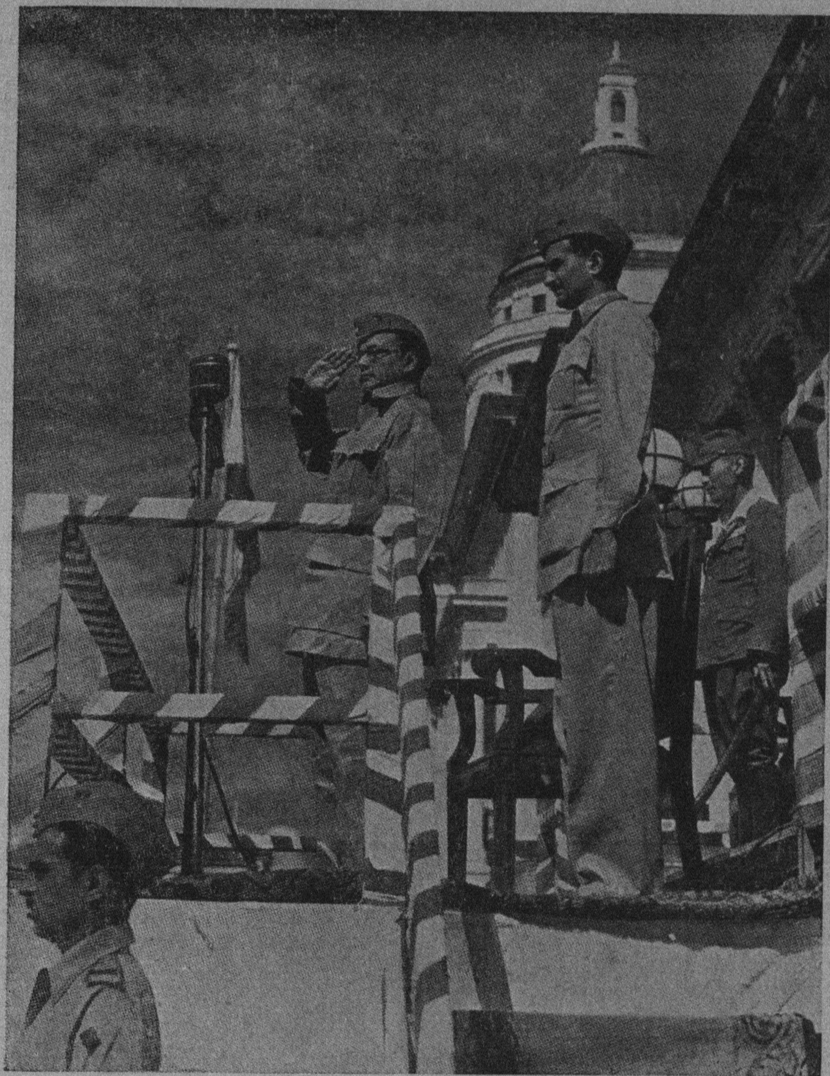
সুভাষ বললেন—"আমার ছুরি-কাঁটা-চামচের বাক্সটা আটকে রাখা হয়েছে কেন?"

"তাই নাকি?"

"হ্যাঁ। ওগুলি নাকি মারাত্মক জিনিস?"

"ঠিক আছে। ভাববেন না। আমি ব্যবস্থা করছি।"

কিছুক্ষণের মধ্যেই সুভাষচন্দ্রের কাঁটা চামচের বাক্স ফিরে এল। জেলার বললেন—"সরি, চকচকে ছুরি দেখে ওরা ভড়কে গিয়েছিল।"



নেতাজী সিঙ্গাপুরে আজাদ হিন্দ ফৌজের কুচকাওয়াজে অভিবাদন গ্রহণ করছেন

কাঁটা-চামচেগুলো মারাত্মক না হলেও জেলার অবিলম্বেই বুঝতে পারলেন—লোকটি মারাত্মক। তাই তাঁকে সরিয়ে নেওয়া হল ইওরোপিয়ান ওয়ার্ডে।

শুধু তাই নয়, কিছুদিন পরে এল আরও এক নয়া আদেশ। তিন দিনের মধ্যে তিনি কারুর সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করতে পারবেন না।

অন্যায়। ভারী অন্যায়। একের পর একটি করে অন্যায়ের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

সুভাষচন্দ্র অনশন শুরু করে বসলেন একদিন। সারা জেলখানায় সাড়া পড়ে গেল। সাড়া পড়ে গেল বাইরেও।

বাংলার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী তখন খাজা নাজিমুদ্দিন। তিনি শরৎচন্দ্রকে অনুরোধ করলেন—"আপনি সুভাষকে নিরস্ত হতে বলুন।"

কিন্তু সুভাষচন্দ্র কি নিরস্ত হবার মানুষ ?

জেলখানায় ডাক্তার আসেন প্রতিদিন। বুক দেখেন। ব্লাড-প্রেসার পরীক্ষা করেন।

যত দিন যায় ডাক্তারের মন উদ্বেগে ভরে ওঠে। রিপোর্ট যায় সরকারী বিভাগে।

প্রথমে অনুরোধ তারপর জোর করে খাওয়ানোর চেষ্টা চলে। কিন্তু কোন ফল হয় না। সরকার বুঝি এবার নিরুপায়।

অবশেষে সুভাষচন্দ্রকে মুক্তি দেওয়া হল পাঁচই ডিসেম্বর উনিশশো চল্লিশ সাল।

বেরিয়ে যখন এলেন তখন তিনি কলকাতা কর্পোরেশনের অল্ডারম্যান। মেয়র তখন সিদ্দিকি। জেলে থাকতেই সুভাষকে এই গৌরবজনক পদে নির্বাচিত করা হয়েছিল।

সুভাষচন্দ্র এলগিন রোডের বাড়িতে এসে উঠলেন গাড়িতে নয়, পায়ে হেঁটেও নয়। অ্যাম্বুলেন্সে।

মুক্তির উল্লাসে উল্লসিত হয়ে উঠল বাড়ির লোকেরা। উল্লসিত

হল বাংলার জনসাধারণ। এবার পাবে তারা নতুন কাজের নির্দেশ। তাদের প্রিয় নেতা ফিরে এসেছেন তাদের মধ্যে।

সুভাষ বাড়ি এসেছে শুনে ছুটে এলেন বাসন্তী দেবী। এলেন মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল হক, এলেন মেয়র সিদ্দিকি। কর্পোরেশনের কাউন্সিলার ও অ্যাসেমব্লীর মেম্বারদের আনাগোনায় বাড়ি সরগরম হয়ে উঠল।

কিন্তু তারপরেই জনসাধারণের আশায় হল জলাঞ্জলি। গাড়ি করে হাজির হল এক ঝাঁক পুলিস। তারা পাহারা দেবে এলগিন রোডের বাড়ি।

সুভাষচন্দ্রের বাড়ি থেকে বের হওয়া নিষেধ। বাড়ির লোক ছাড়া অন্য কারুর সঙ্গে মেলামেশা করতেও পারবেন না তিনি। স্বগৃহে অন্তরীণ সুভাষচন্দ্র। কত দিনের জন্য? তা শুধু পুলিসের বড়কর্তারাই জানেন।

বন্দী হলেন সুভাষ এক বন্দীশালা থেকে আর এক বন্দীশালায়।

॥ ১৫ ॥

দিন রাত্রির প্রহর কাটে পর্দার অন্তরালে।

ধীরে ধীরে অন্তরাল হয়ে যায় বাইরের জনতা। এমন কি ধীরে ধীরে বাড়ির লোকেও দৃষ্টির অন্তরালে চলে যায়।

বাড়ির কোন লোকের তাঁর ঘরে ঢুকবার অধিকার নেই। কোন ছোট ছেলেমেয়েরও ঢোকা নিষেধ। খাবার দিতে হবে ঘরে গিয়ে নয়—বাইরে থেকে।

সুভাষের এই আজগবী খেয়াল দেখে বাড়ির লোকেরা অবাক্ হয়ে যায়। হঠাৎ এমন করবার কারণ কি?

সুভাষচন্দ্র জানালেন—কিছুদিন তিনি মৌনব্রত পালন করবেন। কারুর সঙ্গে কথাবার্তা এমনকি দেখাও করবেন না।

এমনভাবে নিজেকে অন্তরাল করে যিনি রাখলেন—হঠাৎ একদিন খবর রটে গেল তিনি নিরুদ্দেশ। সেদিন উনিশশো একচল্লিশ সালের ছাব্বিশে জানুয়ারী।

কিন্তু পরে জানা গেল এর অনেকদিন আগেই তিনি চলে গেছেন বাড়ি ছেড়ে।

কবে? কেমন করে তা সম্ভব হল?

সবই যেন রহস্যময়!

একজনের মাত্র অধিকার ছিল সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করবার। তিনি শিশির। মেজদা শরৎচন্দ্রের তৃতীয় পুত্র। মাঝে মাঝে সুভাষচন্দ্রের ঘরে তিনি যেতেন। বাড়ির অনেকে রাজনীতির সঙ্গে জড়িত থাকলেও শিশির রাজনীতির ধার ধারতেন না। পুলিসের কোন সন্দেহ ছিল না তাঁর উপর।

এই শিশিরই সুভাষচন্দ্রের বিদেশে অন্তর্ধানের প্রধান সহায়।

মাস্টার তারা সিং জানেন অনেক কিছু। তাঁর কাছ থেকেই পরে শোনা গেল সুভাষচন্দ্র কলকাতা ছেড়ে চলে যান উনিশশো চল্লিশ সালের তেরোই ডিসেম্বর। উত্তমচাঁদ কিন্তু বলেন অন্য কথা। তিনি বলেন, সুভাষচন্দ্র কলকাতা ত্যাগ করেন উনিশশো একচল্লিশ সালের পনেরই জানুয়ারী। লালা উত্তমচাঁদ। তাঁর কথাও অবিশ্বাস করা যায় কি করে? কাবুলের বেতার-যন্ত্র ব্যবসায়ী উত্তমচাঁদ। তাঁর সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের সম্পর্ক কম ছিল না। তিনি সুভাষকে দিয়েছিলেন তাঁর গৃহে নিরাপদ আশ্রয়।

যাই হোক, খবরের কাগজে সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধানের খবর ছাপা হওয়ার অনেকদিন আগেই যে তিনি বাড়ি থেকে পালিয়ে নিরাপদ জায়গায় আশ্রয় নিয়েছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই।

পেশোয়ারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছিল আগে থেকেই। সুভাষচন্দ্র তৈরী হচ্ছিলেন।

নির্দ্দিষ্ট দিন গভীর রাত্রে শিশিরের গাড়ি এসে দাঁড়াল বাড়ির দক্ষিণ দিকে। সন্তর্পণে সুভাষ বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। শিশিরও থমকে গেলেন হঠাৎ। তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আছে একজন অপরিচিত মুসলমান মৌলবী।

উত্তর ভারতীয় মুসলমানের বেশে সুভাষকে চেনাই দায় হয়ে ওঠে।

গাড়িতে উঠে বসলেন সুভাষ। একটু ফিরে তাকালেন ছেড়ে আসা বাড়ির দিকে। মায়ের শয়নকক্ষের দিকেও হয়তো।

মায়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়েও আসা হল না। কিন্তু দেখা করলে তিনি কি বিদায় দিতে পারতেন ছেলেকে? শচীদেবী কি বিদায় দিতে পেরেছিলেন চৈতন্যদেবকে তাঁর সন্ন্যাসযাত্রায়?

গাড়ি ছেড়ে দিল। উধাও হয়ে গেল চোখের নিমিষে।

ঘুমন্ত কলকাতার রাজপথ। জনহীন নগরী। বিদ্যুৎগতিতে পথ অতিক্রম করে গাড়ি এসে পড়ে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডে। বিরাট প্রশস্ত পথ।

গাড়ির চালক শিশির। যাত্রী মুসলমান মৌলবীর বেশে সুভাষ।

গাড়ি এগিয়ে চলে আরও দ্রুতবেগে। অনেক দূরের পথ। এ যে নিরুদ্দেশ যাত্রা।

পার হয়ে যায় প্রহরের পর প্রহর রাত্রি। ভোরের আলোক উঁকিঝুঁকি দেয় আকাশে।

গাড়ি এসে পড়ে ধানবাদের কাছাকাছি। একটু দূরেই বারারি। ওখানেই অশোকের বাড়ি। মেজদা শরৎচন্দ্রের বড় ছেলে অশোক। ডঃ অশোক বোস।

গাড়িটা থেমে যায়। নেমে পড়েন সুভাষ। বিছানা আর সুটকেশ গাড়িতেই পড়ে থাকে। শুধু এটাচি কেসটা হাতে নিয়ে হেঁটে এগিয়ে চলতে থাকেন।

শিশির গাড়ি নিয়ে এগিয়ে চলেন একা। কেউ কাকে যেন চেনেন না।

সকাল হয়েছে তখন। শিশিরের গাড়িটা আগেই এসে পৌঁছাল। কিছুক্ষণ পরে এলেন সুভাষ—মৌলবী সাহেব।

ডঃ বোস আগেই সব জানতেন। কিন্তু তিনি ভাব দেখালেন কিছুই যেন জানেন না। অজানা অচেনা লোক, তাই মৌলবী সাহেবকে থাকতে দেওয়া হল বাইরের ঘরে। পরিচয় দেওয়া হল ইনসিওরেন্স এজেণ্ট বলে।

নিখুঁত ছদ্মবেশ। পরনে শেরওয়ানি, মাথায় ফেজ। ছাঁটা গোঁফ আর ছুঁচলো দাড়িতে এক অপরূপ সজ্জা।

ভৃত্যেরা দেখে, বাড়ির মেয়েরাও দেখে উঁকিঝুঁকি মারে।

ডঃ বোসের সঙ্গে মৌলবী সাহেব কথা বলেন ইংরেজীতে। সবাই অবাক্ হয়ে তাকায়, বুঝতে পারে না কিছু। দুপুরবেলা খাবার আসে বাইরের ঘরে। ভিন্ন ধর্মীয় লোক, তাই ব্যবস্থাও ভিন্ন।

সন্ধ্যাবেলা ব্যস্ত হয়ে ওঠেন মৌলবী সাহেব। "আমি উঠি, আমাকে ট্রেন ধরতে হবে।"

"ট্যাক্সি ডেকে দেই একটা ?" বলেন ডঃ বোস।

"ধন্যবাদ। তার দরকার হবে না। পথে আমি ট্যাক্সি ধরে নেবো।"

বেরিয়ে পড়লেন মৌলবী সাহেব। একটু পরেই গাড়ি নিয়ে বের হলেন শিশির। সঙ্গে ডঃ বোস ও তাঁর স্ত্রী।

একটি জায়গায় এসে হুস করে গাড়ি থেমে গেল। দাঁড়িয়ে আছেন মৌলবী সাহেব। তাঁকে তুলে নেওয়া হল গাড়িতে।

হঠাৎ চোখ পড়ে গেল মৌলবীর দিকে। বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেলেন ডঃ বোসের স্ত্রী। একি! এ যে রাঙা কাকাবাবু!

মৌলবী সাহেব তাকান ডঃ বোসের স্ত্রীর দিকে। কোন কথা বলেন না। কিছুক্ষণের জন্য সবাই নির্বাক্ স্তব্ধ।

গাড়ি ছুটে চলে গোমো স্টেশনের দিকে। দিল্লী-কালকা মেল ধরতে হবে।

, স্টেশনের একটু দূরে এসে গাড়ি থামে।

এবার বুঝি সবার চোখেই দেখা দেয় জল। বিদায় নিয়ে চলে যান মৌলবী সাহেব। ট্রেনের আর বেশী দেরি নেই।

সুভাষচন্দ্রের ঐতিহাসিক অন্তর্ধানে সাহায্য করবার জন্য একদিকে ছিলেন শিশির বসু আর অন্যদিকে ছিলেন আকবর শা। আকবর শা আগেই পেশোয়ারে এসে পৌঁছেছিলেন। খুঁজে বের করেছিলেন মোটর ড্রাইভার আবেদ খাঁকে।

আবেদ খাঁ যথাসময়ে নৌশেরা স্টেশনে এসে হাজির হল। মৌলবী সাহেব নামতেই চিনতে পারল তাঁকে। একটি সংকেত-চিহ্ন ছিল। সেটা দেখাল সুভাষকে। সুভাষ উঠে বসলেন আবেদ খাঁর গাড়িতে।

আবেদ খাঁকে চেনে সে অঞ্চলের সকলেই। পুলিসের লোকেরাও খাতির করে তাঁকে। কাজেই নিরাপদে গাড়ি ছুটল পেশোয়ারের দিকে। সন্ধ্যার একটু আগে পেশোয়ারে গিয়ে পৌঁছলেন সুভাষ।

রাতটা কাটাতে হবে পেশোয়ারেই। শহরের এক সীমানায় সরাইখানা। আবেদ খাঁ সুভাষকে সেখানে নিয়ে গেল। কাছেই থানা। কাজেই খুব সাবধানে থাকতে হল।

যাত্রীদের অনেকেই আবেদের চেনা। তারা জিজ্ঞেস করে—"এটা কেহে?"

আবেদ খাঁ বলে—"আমার দূর সম্পর্কের ভাই। অসুস্থ। অনেক দূরে ফকিরের দরগায় যাবে। মানত আছে সেখানে।"

কম্বল বিছিয়ে দেয় আবেদ খাঁ। সুভাষ কোন রকমে মুখ ঢেকে শুয়ে পড়েন।

ভোরের আলো ফোটবার আগেই জেগে ওঠেন আবার। গাড়ি নিয়ে আবেদ খাঁ তৈরী।

আবার যাত্রা শুরু হয়।

পেরিয়ে যায় সবকদর। পেশোয়ার জেলার শেষ ঘাঁটি। এর পরেই মোমান্দ্ অঞ্চল। ইংরেজ প্রভাবশূন্য মোমান্দ্।

অদূরে আফগানিস্তানের সীমানা। ওটা ছাড়ালেই রাশিয়া।

এখন প্রথম যেতে হবে কাবুল। তারপর অন্য কথা। কিন্তু এখন সেখানে গিয়েও নিশ্চিন্ত থাকতে পারা যাবে কি? সেখানে সব দেশের গোয়েন্দা আর গুপ্তচররা ঘাঁটি করে আছে।

সেজন্য আরও হুঁশিয়ার থাকতে হবে।

সুটকেসে পাঠানের পোশাক ছিল। সুভাষচন্দ্র তাড়াতাড়ি সেই

পোশাক পরে নিলেন। সাজলেন বোবা আর কালা। নাম পালটে গেল। মৌলবী সাহেব হয়ে গেলেন জিয়াউদ্দিন।

এবার আবেদ খাঁর দায়িত্ব শেষ। এলেন ভকৎরাম। নওজোয়ান ভারত-সভার সেক্রেটারী।

কিন্তু নিরাপদ হবার জন্য ভকৎরামকেও মুসলমান পাঠানের পোশাক পরতে হল। তাঁরও নাম গেল পালটে। নাম হল রহমৎ খাঁ।

॥ ১৩ ॥

সুভাষচন্দ্র এলগিন রোডের বাড়ি থেকে চলে গেছেন।

পুলিস টের পায়নি। টের পেলেই হবে বিপদ। তাই সব কিছুই গোপন রাখতে হবে।

যেভাবে সুভাষচন্দ্রকে খাবার দেওয়া হতো, সেই ভাবেই খাবার দেওয়া হতে লাগল। বাড়ির ছেলেরা এক-একদিন এক-একজন পাশের দরজা দিয়ে ঢুকত। খাবার টেনে নিয়ে খেত। যেভাবে খাবার খেয়ে সুভাষচন্দ্র বাইরে এঁটো থালা-বাটি রেখে দিতেন সেভাবেই রেখে দিত তারাও।

নিখুঁত এক অভিনয়।

কিন্তু কতদিন এভাবে খবর চেপে রাখা যায়? ২৬শে জানুয়ারী সকালেই সংবাদপত্রে বড় বড় হরফে ছাপা হল—'সুভাষচন্দ্র নিরুদ্দেশ।'

হুলস্থুল পড়ে গেল সারা দেশে।

এলগিন রোডের বাড়ি তোলপাড়। জননী প্রভাবতী দেবী কেঁদেই আকুল। কোথায় গেল ছেলে! আবার কি বিবাগী হয়ে চলে গেল?

শরৎবাবু বাইরে ছিলেন। খবর পেয়ে ছুটে এলেন। কলকাতার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে করলেন টেলিফোন। টেলিগ্রাম করলেন আলমোড়া, বৃন্দাবন, পণ্ডিচেরী।

গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ তার করলেন এলগিন রোডের বাড়িতে—"সুভাষের অন্তর্ধান সংবাদে বিচলিত হয়ে পড়েছি। মা জননীকে আমার সমবেদনা জানাবে। কোন সংবাদ পেলেই জানাবে আমাকে।"

দলে দলে মানুষ এসে ভিড় করতে লাগল এলগিন রোডের বাড়িতে। এরপর হল পদস্থ পুলিস অফিসারদের আনাগোনা। চলতে লাগল তাঁদের জেরার পর জেরা।

কিন্তু জননী প্রভাবতী দেবী অশ্রুভারাক্রান্ত নয়নে উলটো অভিযোগ করলেন পুলিসের কাছে। বললেন—"বলুন, আমার ছেলেকে আপনারা কোথায় সরিয়ে দিয়েছেন। আপনারা সবাই তাকে শত্রু মনে করতেন। তাই কি লুকিয়ে রেখেছেন তাকে ?"

পুলিস কোন জবাব দিতে পারল না। অফিসাররা চলে গেলেন মাথা নীচু করে।

সত্যি তাঁরা ব্যর্থ। কয়েকদিন আগে একটি জাপানী জাহাজ হঠাৎ এসে কলকাতা থেকে চলে যায়। গুজব রটে সুভাষচন্দ্র সেই জাহাজে জাপান চলে গেছেন। এর ফলে পুলিস তাদের সমস্ত দৃষ্টি ও কর্মতৎপরতা নিবদ্ধ রাখল পুবের দিকে। আর এদিকে সুভাষচন্দ্র নির্বিঘ্নে পশ্চিম দিকে পথের পর পথ অতিক্রম করতে লাগলেন।

ছুটে চলেছে মোটর।

পাছে ধরা পড়ে যান, তাই সোজা পথে না গিয়ে একটা কাঁচা রাস্তা ধরে চললেন। কিন্তু 'গাঢ়ি' নামে একটা গাঁয়ের কাছে এসেই দেখা গেল পথ বন্ধ। মোটর আর চলবে না।

এবার হেঁটে চললেন জিয়াউদ্দিন আর রহমৎ।

দীর্ঘ পথ। এখানে ওখানে ওত পেতে আছে গোয়েন্দা, পুলিস আর গুণ্ডা। ভয় পদে পদে।

"কে ? কোথায় যাও !"

থমকে দাঁড়াতে হল দু'জনকেই। গুণ্ডা না ছদ্মবেশী গুপ্তচর কে জানে ?

কিন্তু রহমৎ খাঁ সতর্ক আগে থেকেই। সুভাষকে বোবা আর কালার অভিনয় করতে বলেছেন। কারণ ঐ অঞ্চলের ভাষায় তিনি একেবারে আনাড়ী।

"গরিব মানুষ। বোবা আর কালা ভাইকে নিয়ে যাচ্ছি পীরের দরগায়। মানত আছে। পীরের দয়ায় আর খুদাতাল্লার রহমতে যদি রোগটা সেরে যায়।"

নিখুঁত ছদ্মবেশ। কেউ কোন সন্দেহ করতে পারল না।

অনেক কষ্টে হেঁটে হেঁটে এসে পৌঁছলেন লালপুরা। এটা আফগানিস্তান। এবার নিশ্চিন্ত অনেকটা। এখানে আগেই ব্যবস্থা করা ছিল। লালপুরার প্রতাপশালী ধনী সর্দার খাঁ সাহেবের বাড়িতে তাঁরা দুজনেই অতিথি হলেন। আফগান সরকারে এই খাঁ সাহেবের প্রভাব ছিল অসীম।

পথশ্রমে ভয়ানক ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন সুভাষচন্দ্র। কিন্তু বেশীদিন এখানে অপেক্ষা করাও চলে না।

খাঁ সাহেব বললেন—"আর সামান্য কয়েক মাইল গেলেই আপনারা কাবুল নদীর তীরে পৌঁছতে পারবেন। সেই নদী পার হলেই ওপারে বাঁধানো রাস্তা। সে পথে বাস চলাচল করে। তারই যে কোন বাসে চড়ে আপনারা কাবুলে পৌঁছতে পারবেন।"

কিন্তু যত সহজে পথের নিশানা বলে দিলেন, সেখানে যাওয়া অত সহজ ছিল না। বিপদের ভয় ছিল পথে, তাই খাঁ সাহেব তাঁদের সঙ্গে একটি পরিচয়পত্র লিখে দিলেন। বললেন—"পথে কোন বিপদে পড়লে বা কেউ আপনাদের আটকালে এই পরিচয়পত্র দেখাবেন—তাহলেই আর কোন অসুবিধা হবে না।"

পারসীভাষায় লেখা পরিচয়পত্র। তাতে লেখা ছিল—"এই পত্র-বাহক রহমৎ খাঁ ও জিয়াউদ্দিন পার্বত্য প্রদেশের অধিবাসী। এঁরা সাখি-সাহেবের দরগায় যাচ্ছেন। এঁদের চরিত্রের জন্য আমি নিজে

দায়ী। কেউ যেন এঁদের কোন ভাবে বিরক্ত করতে না পারে সেই ভরসায় আমি এই পরিচয়পত্র লিখে দিলাম।"

খাঁ সাহেবের চেষ্টায় দু'জন সশস্ত্র প্রহরীও পাওয়া গেল। সবাই মিলে রওনা হলেন কাবুল নদীর দিকে। কিন্তু তীরে পৌঁছেই তাঁদের মন দমে গেল। পারাপারের জন্য কোন নৌকা নেই। কিভাবে পার হবেন?

পরে দেখলেন নদী পার হবার জন্য রয়েছে এক বিচিত্র ব্যবস্থা। কতগুলো ভিস্তির মশক একসঙ্গে বেঁধে তার উপরে জাল বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। জলের উপর ভাসছে সেগুলো। তাতে চড়েই নদী পার হতে হবে।

কিন্তু জিয়াউদ্দিন আর রহমৎ কেউ এই ব্যবস্থার সঙ্গে পরিচিত নন। অনেক কষ্টে ও অতি সাহসে নির্ভর করে তাঁরা কাবুল নদী পার হলেন।

কাবুল নদীর ওপারেই খাস আফগান রাজ্য। আফগান রাজ্যে প্রবেশপথে অসংখ্য বাধা। কারুর সেখানে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে প্রবেশ করবার অনুমতি নেই। তাই প্রহরী দু'জন বিদায় নিল এবার।

পথে পথে খানাতল্লাশীর ঘাঁটি। ছদ্মবেশ হলেও খানাতল্লাশীর ঝুঁকি নেওয়া উচিত হবে না। তাই সেগুলো এড়িয়ে ঘুর পথে যেতে লাগলেন।

'ঠাণ্ডী' নামক এক জায়গায় এসে তাঁরা থামলেন। এখান থেকেই পাওয়া যাবে কাবুল যাবার বাস।

কিন্তু অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেও বাস পাওয়া গেল না। অনেক খোঁজাখুঁজি করে পাওয়া গেল একটি লরী। তাতেই দু'জন উঠে বসলেন।

শীতকাল। পথঘাট বরফে ঢাকা। তারই মধ্য দিয়ে লরী চলতে লাগল।

ঠাণ্ডায় হাত পা বেঁকে আসে—গায়ের রক্ত যেন জমে যায়। মাঝে মাঝে চা খেয়ে শরীরকে একটু গরম রাখতে হয়।

সারা দিন রাত চলল লরী। পরদিন তাঁরা এসে পৌঁছলেন 'বাট্ থাক্-এ'। গাড়ি থামাতে হলো এখানে। পাসপোর্ট পরীক্ষা হবে।

কিন্তু কোথায় পাসপোর্ট? সুভাষচন্দ্রকে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেন অফিসার—কিন্তু তিনি নীরব।

রহমৎ বললেন—"আমার ভাই। বোবা ও কালা। সাখি-পীরের দরগায় যাচ্ছি। যদি পীরের দয়ায় এর রোগ সারে।"

তবু তো পাসপোর্ট চাই।

তখন লালপুরার খাঁ সাহেবের দেওয়া সেই পত্র দেখালেন রহমৎ। অফিসার চুপ হয়ে গেলেন। পথ ছেড়ে দিল প্রহরী।

আবার লরী ছুটে চলল দ্রুতবেগে। কাবুল শহরে এসে যখন লরী থামল তখন বিকেল। ভাড়া মিটিয়ে বিদায় করে দেওয়া হল লরীওয়ালাকে।

ক্ষুধাতৃষ্ণা দুই-ই তখন প্রবল। কিন্তু সবচেয়ে বড় সমস্যা রাত-কাটানো। কোথায় রাত কাটানো যায়?

বাজারের কাছে গিয়ে তাঁরা একজন লোককে জিজ্ঞেস করলেন—"এখানে কোন সরাইখানা আছে কি?"

লোকটি বলল—"ঐ তো সরাইখানা। কিন্তু দেখুন, সেখানে কোন জায়গা আছে কিনা।"

জায়গা অবশ্য পাওয়া গেল। কিন্তু ঘরটি খুব ছোট, কোন জানালা নেই। গুদামঘর বলা চলে। তাতেই কোনরকমে মাথা গুজবার ঠাঁই হল।

রহমৎ খাঁ বললেন—"কাবুলেই থাকেন উত্তমচাঁদ মালহোত্র। রেডিও-ডিলার। তাঁর খোঁজ করতে হবে। তিনি এক সময়ে ছিলেন

নওজোয়ান ভারত-সভার জেনারেল সেক্রেটারী। ১৯৩০ সালে তিনি গ্রেফতারও হয়েছিলেন।”

সুভাষচন্দ্র যেন আলোর সন্ধান পেলেন। বললেন—“সেখানে নিশ্চয়ই আমাদের আশ্রয় মিলবে।”

রহমৎ খাঁ খোঁজ করলেন উত্তমচাঁদের। কিন্তু তিনি বর্তমানে কাবুলে নেই। কয়েকদিন অপেক্ষা করতে হবে এখানেই।

তিন চার দিন নিরাপদেই কেটে গেল। তারপর একদিন রহমৎ এসে বললেন—“সাদা পোশাকে একটা লোক উলটো দিকে ঐ রুটির দোকানে বসে থাকে। আমাদের দিকে কটমট করে তাকায়। মনে হয় পুলিসের লোক।”

সুভাষচন্দ্র বললেন—“তাই নাকি?”

বলতে না বলতেই ছদ্মবেশী পুলিস এসে তাঁদের ঘরের সামনে হাজির হল। কিছুক্ষণ তাঁদের দিকে তীক্ষ্ণভাবে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল—“আপনারা কে? এখানে এসেছেন কেন?”

বিনয়ের অবতার যেন রহমৎ খাঁ। বললেন—“আমার বোবা ও কালা ভাইকে নিয়ে যাচ্ছি সাখি-সাহেবের দরগায়। কিন্তু যে বরফ পড়ছে, পথঘাট সব বন্ধ। কাজেই অপেক্ষা করছি এখানে।”

পুলিস বিশ্বাস করল না। বলল—“আপনারা আমার সঙ্গে কোতোয়ালীতে চলুন।”

জিয়াউদ্দিন ও রহমৎ খাঁ প্রমাদ গনলেন। সর্বনাশ! সব পরিকল্পনা বুঝি এবার ধূলিসাৎ হয়ে যায়।

মনে কোন ভয়ের আভাস দেখালেন না রহমৎ খাঁ। বেশ দৃঢ় কণ্ঠেই বললেন—“দেখুন, আমার যেতে কোন আপত্তিই নেই। কিন্তু আমার ভাই অসুস্থ, সে যাবে কি করে?”

পুলিসের সুর এবার একটু নরম হল। বলল—“দেখুন, এ যাত্রা আমি আপনাদের বাঁচিয়ে দিতে পারি। তবে

আমাকে চা পানের জন্য কিছু দিতে হবে। বড্ড শীত পড়েছে কিনা।"

রহমৎ খাঁ একটি দশ টাকার নোট পুলিসটির হাতে গুঁজে দিলেন। পুলিস খুশী মনে চলে গেল। যাবার সময় বলে গেল—"খুব শীগগির আপনারা এখান থেকে চলে যাবেন, মনে থাকে যেন।"

সেদিন চলে গেল বটে, কিন্তু দু'দিন পরেই আবার এসে হাজির। বলল—"একি, আপনারা এখনো যাননি?"

রহমৎ খাঁ বললেন—"এই যাবো—ভাইটির শরীর একটু ভাল হলেই চলে যাবো দু'একদিনের মধ্যে।" পাঁচটি টাকা দিলেন পুলিসটির হাতে। পুলিস সেলাম জানিয়ে চলে গেল সেদিন।

রহমৎ খাঁ বললেন—আর দেরি করা যায় না। উত্তমচাঁদের খোঁজ এবার করতে হয়।

কিন্তু এখনও যদি তিনি না ফিরে থাকেন, তাহলে?

দিনটা খুব শুভই বলতে হবে। রহমৎ খাঁ রেডিওর দোকানে গিয়ে দেখলেন, উত্তমচাঁদ বসে আছেন। সে দোকানে আছে আরও একজন বালক কর্মচারী। পেশোয়ারী পোশাকে রহমৎ তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। সেলাম জানাতেই উত্তমচাঁদ জিজ্ঞেস করলেন—"কি দরকার?"

আগন্তুক বললেন—"আপনার সঙ্গে একটু ব্যক্তিগত কথা আছে।"

উত্তমচাঁদ আগন্তুককে নিভৃতে নিয়ে গেলেন।

রহমৎ খাঁ বললেন—"আমার নাম ভকৎরাম, মর্দান জেলায় আমার বাড়ি। নওজোয়ান ভারত-সভার আমিও একজন কর্মী ছিলাম।"

উত্তমচাঁদ এবার আগন্তুককে চিনতে পারলেন। জিজ্ঞেস করলেন—"কি ব্যাপারে আপনি আমার কাছে এসেছেন বলুন তো?"

ভকৎরাম বললেন—"সুভাষবাবুর নাম নিশ্চয়ই শুনেছেন। কয়েকদিন যাবৎ তিনি ভারত থেকে পালিয়ে কাবুলে এসেছেন। কিন্তু যে সরাইখানায় আমার সঙ্গে তিনি আছেন, সেখানে পুলিস আমাদের বড়ই উৎপাত করছে। ভারতকে স্বাধীন করার জন্য বাইরের কোন শক্তির সঙ্গে তিনি মিলিত হতে চান। এ অবস্থায় হয়তো সবই বানচাল হয়ে যাবে। তাই সুভাষবাবু আপনার কাছে আশ্রয় চান।"

একথা শুনে উত্তমচাঁদ যেন লাফিয়ে উঠলেন। বললেন—"সুভাষবাবু আমার আশ্রয়ে থাকবেন এ তো আমার খুবই ভাগ্যের কথা।" তারপর কি ভেবে বললেন—"কিন্তু একটা অসুবিধা রয়েছে। আপনারা দু'জনেই আছেন মুসলমানের বেশে। আমি থাকি হিন্দু পাড়ায়। হিন্দুর বাড়িতে দু'জন মুসলমান থাকলে সন্দেহের ব্যাপার হবে!"

"তাহলে কি হবে?" অনেকটা নিরাশ কণ্ঠে বলেন ভকৎরাম।

উত্তমচাঁদ বললেন—"আরও একটি অসুবিধা রয়েছে। আমার স্ত্রী জার্মান মহিলা। তিনি শিক্ষিতা ও আধুনিকা। তাঁকে না জানিয়ে আপনাদের বাড়িতে রাখলে আর এক সমস্যার সৃষ্টি হবে।"

কিছুক্ষণ চুপ থেকে ভেবে নিয়ে বললেন—"এ ব্যাপারে আমার এক মুসলমান বন্ধুর সাহায্য আমি চাইব। মুসলমানের বাড়িতে আপনারা থাকলে কারুর কোন সন্দেহের কারণ হবে না।"

"কিন্তু সেখানে থাকা নিরাপদ হবে কি?" জিজ্ঞেস করলেন ভকৎরাম।

"হ্যাঁ। সেই মুসলমান বন্ধুটিকে আমরা ডাকি হাজি সাহেব। তিনিও এক জার্মান মহিলাকে বিয়ে করেছেন। বহুদেশ ভ্রমণ করেছেন তিনি। বয়েস হয়েছে ভদ্রলোকের। ব্রিটিশ-বিদ্বেষী, ভারতীয়



নেতাজীর সিঙ্গাপুরে গমন, সঙ্গে রাসবিহারী বসু

আন্দোলনের প্রতি বিশেষ সহানুভূতি আছে। যা হোক, বিকেল বেলায় আপনি সুভাষবাবুকে নিয়ে আসবেন।"

বিকেলবেলায় নির্দিষ্ট সময়েই সুভাষচন্দ্রকে নিয়ে গেলেন ভগৎরাম। দু'জনেই ছদ্মবেশে।

উত্তমচাঁদ ভেবেছিলেন হাজি সাহেবের বাড়িতে সুভাষচন্দ্রকে রাখবেন। কিন্তু সেখানে সুবিধা হল না। হাজি সাহেব একজন পলাতক আসামীকে ঠাঁই দিতে রাজী হলেন না।

অগত্যা উত্তমচাঁদ নিজের বাড়িতেই সুভাষচন্দ্রকে আশ্রয় দিলেন।

প্রথমে উত্তমচাঁদ ভেবেছিলেন স্ত্রীর কাছে এ বিষয়ে কিছু বলবেন না। কিন্তু পরে স্ত্রীর সঙ্গে মনোমালিন্য হবে ভেবে প্রকৃত ঘটনা খুলে বললেন।

জার্মান মহিলা স্বাধীনতার মর্যাদা বুঝতেন। তাই সুভাষচন্দ্রের পরিচয় পেয়ে তিনি খুব আনন্দিত হলেন। যতদিন সুভাষ তাঁর বাড়িতে ছিলেন তিনি তাঁর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে নজর রাখতেন। বিদেশযাত্রার ব্যাপারেও তিনি সাহায্য করেছিলেন অনেক।

সুভাষচন্দ্রের ইচ্ছা, তিনি মস্কো যাবেন। তাই ভগৎরাম রাশিয়ার রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে কথাবার্তা চালাবার চেষ্টা করেন। কিন্তু বহু চেষ্টাতেও কোন ফল হল না।

অবশেষে ইতালীর রাষ্ট্রদূতকে সমস্ত ব্যাপার জানানো হল। ইতালীর রাষ্ট্রদূত সীনর ক্যারনী ও তাঁর পত্নী মিসেস ক্যারনী এ ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করলেন। রোম থেকে যাতে সুভাষচন্দ্রের পাসপোর্ট মঞ্জুর হয়ে আসে সেজন্য চেষ্টা করতে লাগলেন।

বেশ কিছুদিন চলে গেল। কিন্তু পাসপোর্ট মঞ্জুর হয়ে এল না। চঞ্চল হয়ে উঠলেন সুভাষচন্দ্র। অন্য কোথাও যাওয়ার জন্য নানা ভাবে চেষ্টা করতে লাগলেন।

এমন সময় হঠাৎ একদিন এসে হাজির হলেন ইতালীর রাষ্ট্রদূতের

পত্নী মিসেস ক্যারনী। তাঁর হাতে পাসপোর্ট। অক্ষশক্তির অন্তর্ভুক্ত ইতালী ও জার্মানী সুভাষচন্দ্রের পাসপোর্ট মঞ্জুর করেছেন।

কিন্তু সুভাষচন্দ্র এখন আর জিয়াউদ্দীন নন। পাসপোর্টে তাঁর নাম লেখা হয়েছে অরল্যাণ্ডো ম্যাজোটা—ইতালীর অধিবাসী।

আঠারোই মার্চ সুভাষচন্দ্র কাবুল থেকে যাত্রা করলেন। তাঁর সঙ্গী হলেন একজন ইতালীয় ও দু'জন জার্মান। তাঁদের মধ্যে ডাঃ ওয়েলার ছিলেন জার্মান এঞ্জিনিয়ার, আফগান সরকারের কর্মচারী।

কাবুল থেকে রাশিয়ার সীমান্ত অবধি গেলেন মোটরে। রাতটা কাটালেন পুল-থুমড়ীতে। পরদিন তাঁরা রাশিয়ায় প্রবেশ করলেন।

ট্রেনে করে এলেন মস্কোতে। মস্কোতে পৌঁছলেন বটে, কিন্তু সরকারীভাবে সোভিয়েট সরকার কোন সাহায্য সুভাষচন্দ্রকে করলেন না। করার হয়তো উপায়ও ছিল না। তবে সুভাষচন্দ্রের কোন অসুবিধা যাতে না হয় সেদিকে সোভিয়েট সরকারের দৃষ্টি ছিল। ইংরেজের সঙ্গে সোভিয়েটের নূতন করে আলোচনা চলছিল ক্রীপস-এর মাধ্যমে। যদি আলোচনা সফল হয় তবে তার ফল হবে জার্মানীর সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ।

সুভাষচন্দ্র সেজন্যই মস্কোতে অপেক্ষা করলেন না। রওনা হলেন জার্মানীর দিকে। বার্লিনে এসে পৌঁছলেন আটাশে মার্চ।

সুভাষচন্দ্র তো চলে এলেন কাবুল ছেড়ে। ওদিকে কিছুদিনের মধ্যেই উত্তমচাঁদের অবস্থা হয়ে উঠল শোচনীয়। ব্যাপারটা গোপন রইল না। পুলিস খোঁজখবর করতে করতে উত্তমচাঁদের বাড়ি এসে হাজির হল।

উত্তমচাঁদকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করা হল। করা হল নানাভাবে

অনুসন্ধান। অবশেষে পুলিস প্রমাণ করল সুভাষচন্দ্রের পলায়নে সাহায্য করেছেন উত্তমচাঁদ। সেই অপরাধে উত্তমচাঁদের হল দীর্ঘকাল কারাদণ্ড। শুধু তাই নয়, তাঁর লক্ষাধিক টাকার সম্পত্তি ক্রোক ও নিলামে বিক্রি করে দিয়ে তাঁকে সর্বস্বান্ত করে দেওয়া হল।

অথচ এই উদারহৃদয় পুরুষের সাহায্য না পেলে সুভাষচন্দ্রের সমস্ত পরিকল্পনা হয়তো ব্যর্থ হয়ে যেত।

রচিত হতো না এই নূতন ইতিহাস।

॥ ১৭ ॥

গরম ইওরোপের আবহাওয়া।

চলেছে হিটলারের বেপরোয়া অভিযান।

দু'টি মহানায়কের আবির্ভাব হয়েছে ইওরোপে। একজন জার্মানীর হিটলার আর একজন ইতালীর মুসোলিনী।

এ দু'জন যেন সারা ইওরোপকে পাগল করে তুলল। ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠল ইংরেজ।

বার্লিনে এসে সুভাষচন্দ্র সুযোগ খুঁজতে লাগলেন।

কাবুলের জার্মান রাষ্ট্রদূত সুভাষচন্দ্রের উপর বিশেষ সহানুভূতি সম্পন্ন ছিলেন না। তাই জার্মানীতে আসবার ব্যাপারে কোন সাহায্য তাঁর কাছ থেকে পাওয়া যায়নি। অথচ ইতালীর রাষ্ট্রদূত অনেক সাহায্য করেছেন সুভাষচন্দ্রকে।

ইতালীর রাষ্ট্রদূত এ ব্যাপারে একটি চমৎকার রিপোর্ট লিখেছিলেন। লিখেছিলেন: "বোসের প্রথম কাজ হবে ইওরোপের কোন স্থানে একটি অস্থায়ী স্বাধীন ভারত সরকার গঠন করা এবং তা ঘোষণা করা। ইতালী, জার্মানী এবং জাপান এই সরকারকে স্বীকৃতি জানাবে, এও তাঁর কামনা।...বোস মনে করেন যে ভারতবর্ষ বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত। প্রাথমিক কাজ শুরু করবার সাহসের শুধু অভাব।...যদি একবার জার্মানী কিংবা ইতালী অথবা জাপান ভারতের সীমান্তে গিয়ে দাঁড়াতে পারে, ভারতীয় সৈন্য ইংরেজের পক্ষ ছেড়ে চলে আসবে। জনসাধারণ বিদ্রোহ করবে। অবিলম্বে ইংরেজ প্রভুত্বের হবে অবসান।"

সেই সুযোগ নিতেই এসেছেন সুভাষ।

অরল্যাণ্ডো ম্যাজোটা নামে একজন আগন্তুক এসে দাঁড়ালেন জার্মান বৈদেশিক দপ্তরের সামনে। সঙ্গে তাঁর ইটালিয়ান পাসপোর্ট। এই আগন্তুক সম্বন্ধে কোন আগ্রহ দেখা গেল না জার্মানীর। জার্মানীর ঘরে ঘরে তখন বিপুল রণসজ্জা।

১৯৪১ সালের ২২শে জুন হিটলার ঝাঁপিয়ে পড়লেন রাশিয়ার বুকে।

সমস্ত জগৎ স্তম্ভিত, বিব্রত। বিব্রত হলেন অরল্যাণ্ডো ম্যাজোটাও। তিনি আর কেউ নন—ছদ্মবেশে সুভাষচন্দ্র।

সুভাষচন্দ্র হিটলারের অজানা নন—হিটলার জানেন সুভাষচন্দ্র ভারতবর্ষের বিপ্লবের প্রতীক—ইংরেজ-বিরোধী। তবু পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারলেন না সুভাষকে।

ম্যাজোটা নিরাশ হলেন, কিন্তু ভেঙে পড়লেন না। জার্মান বৈদেশিক দপ্তরে তাঁর স্থান হল না। তিনি ক্লান্তপদে এসে ঢুকলেন ব্রিটিশ দূতাবাসের পুরোনো বাড়িতে।

হিটলারের প্রধান শত্রু ইংরেজ। ইংরেজের শত্রু সুভাষ। এখানেই হিটলার ও তাঁর বৈদেশিক দপ্তরের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের সুর এক তারে বাঁধা। এই সুযোগ হিটলারও ছাড়তে পারেন না।

সত্যি ছাড়লেন না। ভুল ভাঙল একদিন হিটলারের। সুভাষচন্দ্রের দুর্লভ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কাছে টেনে নিয়ে এল হিটলার ও রিবেনট্রপকে। সুভাষচন্দ্রের পরিকল্পনা যাতে রূপায়িত হয়ে ওঠে সেজন্য তাঁরা দিলেন সাহায্যের প্রতিশ্রুতি।

কিছুদিনের মধ্যেই বার্লিনে সুভাষচন্দ্রের আজাদ-হিন্দ্ সংঘ গড়ে তোলার পরিকল্পনা স্থির হয়ে গেল।

জার্মানীর বৈদেশিক দপ্তরে পেশ করা হল সমগ্র পরিকল্পনার খসড়া। সংঘের অধীনে থাকবে একটি প্রচার বিভাগ। রেডিও মারফত

বক্তৃতা হবে নানা ভাষায়। ইংরেজী, বাংলা, হিন্দী এবং আরও কয়েকটি ভারতীয় আঞ্চলিক ভাষার মাধ্যমে প্রচার চালানো হবে ভারতবর্ষের উদ্দেশ্যে। আর সামরিক ব্যবস্থায় গড়ে তুলতে হবে আজাদ-হিন্দ্ ফৌজ।

এখন প্রয়োজন হল কর্মীর। উৎসাহী ও সক্ষম কর্মীর সাহায্যে সার্থক করে তুলতে হবে এই পরিকল্পনা। ইওরোপের নানা স্থানে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য ভারতবাসী। এদের অধিকাংশই ছাত্র, কিছু চাকুরে আর কিছু ব্যবসায়ী। রাজনীতির ধার এরা প্রায় কেউ ধারে না। এদের ভেতর নেই সেরূপ চর্চা ও সংযোগ। সুভাষচন্দ্র ভাবলেন—এদের সক্রিয় করে তুলতে হবে এদের একতাবদ্ধ করতে হবে।

যেখানে যত ছিলেন ভারতবাসী ও ভারতহিতৈষী তাঁদের প্রায় প্রত্যেকের কাছেই গেল চায়ের আমন্ত্রণ। আমন্ত্রণকারীর নাম অরল্যাণ্ডো ম্যাজোটা।

চিঠি পেয়ে অবাক্ হলেন অনেকেই। কে এই অরল্যাণ্ডো ম্যাজোটা? কি এই আমন্ত্রণের উদ্দেশ্য?

কিন্তু গেলেন প্রায় সবাই।

চেহারা দেখে ও আদর আপ্যায়নে অতিথিরা সকলেই খুশী।

উন্নতশির, দীর্ঘদেহী সুদর্শন মানুষটির দিকে অবাক্ হয়ে তাকিয়ে থাকেন অনেকেই। চেনা চেনা মুখ যেন। মনে হয় ছবি দেখেছেন খবরের কাগজে।

শুধুই কি ছবি দেখেছেন? নাম কি শোনেননি কেউ?

হ্যাঁ, নামও শুনেছেন। সুভাষচন্দ্র বোস।

প্রথমে যাঁরা এলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন অস্ট্রিয়াবাসী ভারত-প্রেমিক লিওপোল্ড ফিশার। আর এলেন নাম্বিয়ার, গণপুলে,

আবিদ হাসান, ডঃ গিরিজা মুখার্জী, প্রমোদ দাশগুপ্ত, ডঃ সুলতান, এম. ভি. রাও, ডঃ মল্লিক প্রভৃতি।

সুভাষচন্দ্রের পরিকল্পনা সবাই সমর্থন করলেন।

এবার আর কোন বাধা নেই।

গড়ে উঠল বার্লিনে আজাদ-হিন্দ্ সংঘ।

আজাদ-হিন্দ্ সংঘ নয়, যেন ক্ষুদ্র একটি নূতন ভারতবর্ষ।

শুরু হল কাজ।

মিস এমেলি সেঙ্কল নিয়ে এলেন কয়েকজন জার্মান ও অস্ট্রিয়ান ছেলেমেয়েকে। টাইপ করা, চিঠি লেখা, অতিথিদের সংবর্ধনা—কাজের কি অভাব আছে?

আজাদ-হিন্দ্ সংঘের প্রথম বৈঠক বসল ২রা নভেম্বর, ১৯৪১। এই বৈঠকেই সুভাষচন্দ্রকে নেতা নির্বাচিত করা হল। সুভাষ নেতা ছিলেন—হলেন নেতাজী। আরও একটি অবিস্মরণীয় কথার জন্ম হল—'জয় হিন্দ্'।

॥ ১৮ ॥

সমগ্র বিশ্ব চমকে উঠল। আমেরিকার সুরক্ষিত নৌঘাঁটি পার্ল হারবার আক্রমণ করে বসল জাপান। হংকং, মালয়, গুয়াং, ফিলিপাইন, ওয়েক ও মিডওয়ে দ্বীপের বুকেও সে চেপে বসল।

আমেরিকা চুপ করে রইল না। ৮ই ডিসেম্বর সে অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল।

ওদিকে জার্মানী, ইটালী ও জাপানকে নিয়ে গড়ে উঠেছে ত্রিপক্ষ। বার্লিনে স্বাক্ষরিত হয়ে গেছে ত্রিপক্ষীয় চুক্তি। জাপানের এই সব কার্যকলাপের অজুহাত নিয়ে আমেরিকা তার পুরোনো বন্ধু ইংলণ্ডের সঙ্গে জোট বাধল।

ক্রমবর্ধমান শক্তি নিয়ে হিটলার ইওরোপের বিরাট ভূখণ্ড গ্রাস করতে লাগলেন, রাশিয়াও বাদ গেল না।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বোকামি আমেরিকা ভুলে যায়নি। তখন তার সাম্রাজ্যবাদী ক্ষুধা খুব প্রবল ছিল না। তাই ভাগ বাঁটোয়ারাতেও আগ্রহ ছিল না তার। কিন্তু এই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সে সচেতন। তাই সে হিটলারকে আর জাপানকেও আর বাড়তে দিতে রাজী নয়। কিন্তু তা করতে হলে রাশিয়াকে বাঁচাতে হবে। এটা তাকে করতে হচ্ছে রাশিয়ার প্রতি অনুরাগ বশে নয়, নিজের গরজে। কারণ কম্যুনিজমকে সে দেখতে পারে না দু' চোখে।

হিটলার সোভিয়েট রাশিয়াকে নিয়ে হিমশিম খেতে লাগলেন।

জাপান কিন্তু এগিয়ে চলেছে।

১৯৪২ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী সিঙ্গাপুরের পতন হল। যে

সিঙ্গাপুরের দুর্ভেদ্য দুর্গ ইংরেজ গড়ে তুলেছিল সুদীর্ঘ বিশ বছরে তা হারাতে পুরো দুটো দিনও সময় লাগল না।

ইংরেজের রণতরী 'প্রিন্স অব ওয়েলস্' ও 'রিপালস্' ডুবে গেল মহাসাগরের তলায়। সেই সঙ্গে বিরাট নৌবহরও ধ্বংস হয়ে গেল। জাপান যেন ভেলকি দেখাতে লাগল সারা জগৎকে।

জাভার পতন হল তার কয়েকদিন বাদেই। ব্রহ্মদেশ জাপানের উদ্যত খড়্গের নীচে থরথর করে কাঁপতে লাগল।

সিঙ্গাপুরের পতন ইংরেজের বুকে এক বিরাট শেল হানল। প্রায় একলক্ষ ইংরেজ ও দেশীয় সৈন্য নিয়ে জেনারেল পারসিভ্যাল জাপানের কাছে আত্মসমর্পণ করলেন।

পৃথিবীর গতির চাকা যেন ঘুরে গেল।

জাপানের আক্রমণে চীনের তখন নাভিশ্বাস।

সহসা চিয়াং কাইসেকের মনে ভারত আগমনের আগ্রহ জেগে উঠল। যুদ্ধ শুরু হবার সময় জওহরলাল চীনে গিয়েছিলেন। সেই সময় আবদ্ধ হয়েছিলেন চিয়াং কাইসেক দম্পতির সঙ্গে নিবিড় বন্ধুত্বসূত্রে। নিজের দেশের এই বিপর্যয় সত্ত্বেও চিয়াং-দম্পতি ভারতপ্রেমে পাগল হয়ে উঠলেন। অবশেষে একদিন এসেও গেলেন দিল্লীতে। ৯ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪২।

দিল্লীর লাট ভবনে জওহরলাল নেহরু ও আবুল কালাম আজাদ চীনা দম্পতির সঙ্গে আলোচনায় বসলেন।

১৯৪২ এর ২২শে মার্চ বিলেত থেকে স্যার স্ট্র্যাফোর্ড ক্রীপস দিল্লী এসে পৌছলেন।

ক্রীপস আগেও একবার এসেছিলেন। ১৯৩৯ সালে। তখন এসেছিলেন বেসরকারী দূত হিসাবে। কিন্তু এখন তিনি খাস বিলাতী মন্ত্রিসভার ক্ষমতাসম্পন্ন সদস্য।

১২ই এপ্রিল ক্রীপস বিদায় নিলেন ভগ্ন হৃদয়ে। ভারতের সঙ্গে আলোচনা তাঁর ব্যর্থ হল। তবু তাঁর একমাত্র ভরসা জওহরলালের আশ্বাস। নেহরু তাঁকে স্পষ্ট করে জানিয়ে দিলেন—"জাপানকে আমরা রুখবই। আক্রমণকারীর কাছে আমরা আত্মসমর্পণ করব না। অতীতে যাই ঘটে থাকুক—ভারতবর্ষে ইংরেজের যুদ্ধপ্রচেষ্টা কোন প্রকারে বিঘ্নিত হতে দেব না।"

কিন্তু গান্ধীজীর সঙ্গে জওহরলালের মতের মিল হল না সেদিন। গান্ধীজী বললেন—"জাপান যদি ভারতবর্ষ আক্রমণ করে তবে ইংরেজদের জন্যই করবে। ইংরেজ যদি ভারত ছেড়ে চলে যায়, জাপানের ভারত আক্রমণের প্রয়োজনীয়তাও ফুরিয়ে যাবে।"

সহসা সাগরপার থেকে ভেসে এল এক বজ্রগম্ভীর কণ্ঠস্বর। বেতারের বাণী মুখর হয়ে উঠল……'আমি সুভাষ……জয় হিন্দ্।'

এ বাণী শোনেন জওহরলাল, শোনেন আজাদ, শোনেন গান্ধীজী। হাজার হাজার ভারতবাসীও সেদিন শুনতে পায়!

ঝংকৃত হয়ে উঠে ভারতবাসীর মন।

আজাদ-হিন্দ্ বাহিনী গড়ে তুলেছেন সুভাষ।

১৯৪১ সালের নভেম্বর মাসে আজাদ-হিন্দ্ রেডিওর সূচনা হল। প্রথমে জাতীয় সংগীত তারপর নেতাজীর বক্তৃতা। 'জয় হিন্দ্' দিয়ে শুরু, 'জয় হিন্দ্' দিয়ে শেষ।

ভারতবর্ষের মানুষের কানে তিনি আপসহীন সংগ্রামের বাণী শোনাতে লাগলেন। শোনাতে লাগলেন বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জাতির মুক্তির ইতিহাস। ভারতের মুসলিম জনতার কানেও তিনি দিতে লাগলেন নব্য তুর্কীর জন্মদাতা কামাল আতাতুর্কের বাণী।

কেমন করে কামাল আতাতুর্ক মরা তুরস্কের দেহে প্রাণ সঞ্চার করেছেন তার কাহিনীও শোনাতে লাগলেন।

সামান্য কয়েকজন কর্মী নিয়ে প্রথমে শুরু হল সুভাষচন্দ্রের কাজ। কিন্তু তাঁর পরিকল্পনা যে অনেক বড়—অনেক দূর তাঁকে এগিয়ে যেতে হবে। স্বাধীন ভারতবর্ষ গড়ে তুলতে হবে স্বাধীন দেশের দৃষ্টান্তে। শোষিত ভারতের অর্থনৈতিক রূপ নূতন করে গড়ে তুলতে হবে। নূতন ভারত গড়ে উঠবে শিল্পে, বাণিজ্যে ও কৃষিসম্পদে। কিন্তু সব চেয়ে আগে চাই রক্ষিবাহিনী। ফৌজ। ওরা না থাকলে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা প্রাণ দিয়ে রক্ষা করবে কে?

সিদিবারানি, তব্রুক আর মারসট্রুতে রোমেল প্রচুর ভারতীয় সৈন্য বন্দী করেছেন। আফ্রিকার রণক্ষেত্র মূলতঃ ছিল ইটালীর অধিনায়কত্বে। তাই বন্দীরাও প্রথমে ইটালীতেই আসত। এদেরই একটা অংশ সংখ্যায় প্রায় দশ হাজার, আনা হয়েছিল জার্মানীতে।

কয়েকজন করে ভারতীয় বন্দীকে বার্লিন রেডিও স্টেশনে নিয়ে আসা হত। প্রয়োজনমত তাদের দিয়ে বক্তৃতা করানো হত, হিন্দী বা উর্দু ভাষায় কোন কোন জিনিস অনুবাদ করিয়ে নেওয়া হত মাঝে মাঝে। ওদের সঙ্গে নেতাজীর আলাপ হয়ে গেল একদিন।

মনের পরিকল্পনা সার্থক করবার সূত্র খুঁজে পেলেন এবার। চোখে ভেসে উঠল স্বপ্ন…ফৌজ…আজাদ-হিন্দ্ ফৌজ।

জার্মানীর আন্নাবুরগ ক্যাম্পে বন্দী জীবনযাপন করছে ভারতীয় বন্দী সৈনিকরা। এই সুবর্ণ সুযোগ!

বৈদেশিক দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে লাগলেন নেতাজী। সব ব্যবস্থা পাকাপাকি করতে খুব বেশী সময় লাগল না। ছুটলেন বন্দী শিবিরে।

হাজার হাজার ভারতীয় বন্দী।

সহসা কোন প্রস্তাব নেতাজী তাদের কাছে দিলেন না। বেশ

কয়েকদিন প্রাণ খুলে তাদের সঙ্গে মিশলেন। শুনলেন তাদের সুখ-দুঃখের কাহিনী।

তারপর ধীরে ধীরে বলতে লাগলেন ভারতবর্ষের কথা—জাতির দুর্দশা আর লাঞ্ছনার কাহিনী। তারপর নিজের উদ্দেশ্যও একটি একটি করে তাদের কাছে ব্যক্ত করতে লাগলেন।

প্রথম তারা কি করবে স্থির করতে পারল না। তারপর অবচেতনার দ্বার যেন ধীরে ধীরে খুলতে লাগল। জাগতে লাগল তাদের মনে নূতন অনুভূতি। তারা বুঝতে পারল দেশ···জাতি···হিন্দু মুসলমান···সবকিছু মিলিয়ে অখণ্ড হিন্দুস্থান······আর তার সঙ্গে নেতাজী সুভাষচন্দ্র।

নেতাজীর চোখের পর্দায় ভেসে উঠল এক স্পষ্ট ছবি···আজাদ হিন্দ্ ফৌজ···ভারতীয় লিজিয়ন।

সার্থক হল সেই স্বপ্ন একদিন—এক শুভক্ষণে। গড়ে উঠল আজাদ-হিন্দ্ ফৌজ। সেদিন সারা বার্লিন শহরের ভারতীয়রা এলেন উদ্বোধন উৎসবে। চোখে আনন্দের অশ্রু···বুকে আনন্দের শিহরন।

স্বাধীন ভারতের কল্পনায় অধীর হয়ে উঠল সকলের মন।

শুরু হল আজাদ-হিন্দ্ ফৌজের কুচকাওয়াজ। ফরওয়ার্ড মার্চ।

ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা চলল ফৌজের আগে। সকলের গায়ে রঙীন ব্যাজ···তাতে ঝাঁপিয়ে পড়া বাঘের ছবি। আক্রমণোদ্যত ব্যাঘ্র! শত্রুর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ার উৎসাহের প্রতীক।

জয় হিন্দ্।

॥ ১৭ ॥

সিঙ্গাপুরের পতনের পর ভারতীয় সৈন্যরা বন্দী হল জাপানের হাতে।

জাপানী সৈন্যদের অধ্যক্ষ মেজর ফুজিয়ারা। ফুজিয়ারা চতুর ব্যক্তি। ভাবলেন কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলবেন। ভারতীয় সৈন্যদের কাজে লাগাবেন প্রাচ্যে ব্রিটিশ শক্তিকে খর্ব করার কাজে।

তিনি ভারতীয় বাহিনীর উদ্দেশ্যে বললেন—"জাপান পূর্ব এশিয়ায় সমস্ত জাতিকে স্বাধীন ও মুক্ত দেখতে চায়। কিন্তু ভারতের স্বাধীনতা ছাড়া সুদূর প্রাচ্যের পরিস্থিতি কখনও ভাল হতে পারে না। কাজেই ভারতের সেই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য জাপ সরকার সকল রকম সাহায্য ও সহযোগিতা করতে প্রস্তুত। তাই আমি আপনাদের যুদ্ধবন্দীরূপে দেখতে চাই না। আমাদের পক্ষ থেকে বলতে পারি, আপনারা স্বাধীন। আমি ক্যাপ্টেন মোহন সিং-এর হাতে আপনাদের সমর্পণ করছি।"

ক্যাপ্টেন মোহন সিং যেন হাতে স্বর্গ পেলেন। বললেন ভারতীয় সৈনিকদের উদ্দেশ করে—"বর্তমানে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য ভারতীয়দের যুদ্ধ করবার এক অপূর্ব সুযোগ এসেছে।"

এর পর মালয়ের বিভিন্ন স্থান থেকে আগত ভারতীয় নেতৃবৃন্দ সিঙ্গাপুরে একটি সভায় মিলিত হলেন।

সেই সভায় স্থির হল টোকিওতে একটি শুভেচ্ছা দল পাঠানো হবে।

ভারতের পলাতক বিপ্লবী রাসবিহারী বসু তখন জাপানে। তিনি টোকিওতে এক সম্মেলন আহ্বান করলেন। তাতে মালয়ের

সেই শুভেচ্ছা-দলের প্রতিনিধি ছাড়াও হংকং, সাংহাই ও জাপান প্রবাসী ভারতীয় প্রতিনিধিরা উপস্থিত হলেন।

১৯৪২ সালের ১৫ই থেকে ২৩শে জুন ব্যাঙ্ককে বসল একটি প্রতিনিধি সম্মেলন। জাপান, মাঞ্চুকুও, হংকং, জাভা, মালয় ও শ্যাম থেকে একশোজন প্রতিনিধি এলেন। ভারতীয় বাহিনী হতেও এলেন প্রতিনিধি। তাঁরা সকলেই যুদ্ধবন্দী ছিলেন। এই সভায় প্রস্তাব গৃহীত হল—

ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য পূর্ব এশিয়ার প্রবাসী ভারতীয়দের নিয়ে একটি আজাদ-হিন্দ্ সংঘ গঠন করতে হবে।

সেই সংঘের আদর্শ কার্যক্রম ও সকল প্রকার পরিকল্পনা হবে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের আদর্শ, কার্যক্রম ও তার পরিকল্পনা অনুযায়ী। চলবে সে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্ব মেনে। কংগ্রেসের আন্দোলনের সঙ্গে থাকবে তার যোগসূত্র।

এভাবেই ব্যাঙ্কক সম্মেলন হতে গণতান্ত্রিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে আজাদ-হিন্দ্ সংঘ গঠিত হল। তার সভাপতি হলেন রাসবিহারী বসু।

এদিকে ভারতে গান্ধীজীর নেতৃত্বে কংগ্রেস ১৯৪২ সালের ৮ই আগস্ট "ভারত ছাড়" প্রস্তাব গ্রহণ করল। সমগ্র ভারতবর্ষে ধ্বনিত হয়ে উঠল সেই বাণী। আর সেই সঙ্গে উঠল ভারতবাসীর সংকল্পের শপথ—"করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে"।

* * *

সাগরপার থেকে একদিন ভেসে এল সুভাষের কণ্ঠস্বর। ক্রীপস প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের জন্য ভারতবাসীকে জানালেন অকুণ্ঠ অভিনন্দন। "আমার ভাইবোনেরা, ইংরেজের জঘন্য প্রস্তাব তোমরা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছ। শাবাশ।"

৮ই আগস্ট নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির বম্বে অধিবেশনে কুইট ইণ্ডিয়া প্রস্তাব গৃহীত হল। ৯ই আগস্ট ভোর হতে না হতেই সমস্ত নেতারা হলেন বন্দী।

জনসাধারণের বিক্ষোভ দেখা দিল বিদ্রোহের রূপ নিয়ে। গর্জে উঠল সারা ভারতের নরনারী—"ইংরেজ ভারত ছাড়ো"।

নেতাজী এই রকম একটা জিনিস চেয়েছিলেন। এবার তিনি দ্বিগুণ উৎসাহে মেতে উঠলেন।

পনের জন নিয়ে শুরু হয়েছিল আজাদ-হিন্দ্ ফৌজের প্রথম বাহিনী। এখন দাঁড়িয়েছে সাড়ে তিন হাজার। আরও বহু ভারতীয় বন্দী সৈন্য ফৌজে যোগ দেবার জন্য উৎসুক হয়ে রয়েছে।

কিন্তু ফৌজের সংখ্যা শুধু বাড়ালেই চলবে না। তাদের খরচ যোগাতে হবে তো? টাকা কোথায়?

হিটলার এতদিনে সদয় হয়েছেন নেতাজীর উপরে। বুঝতে পেরেছেন তাঁর উদ্দেশ্য সাধন করতে হলে নেতাজীর সহায়তাও দরকার।

অর্থ-সাহায্য পাওয়া গেল জার্মানীর কাছ থেকে। নেতাজী অবশ্য ধার হিসেবেই টাকাটা নিলেন।

ইতালী বন্দী শিবিরে যে সব ভারতীয় সৈন্য ছিল তারা ছিল খুবই কষ্টে। আজাদ-হিন্দ্ ফৌজের শিবিরে এসে তারা যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

ফৌজের শিক্ষাকেন্দ্র হল কোয়েনিগ্‌সক্রয়েক নামক জায়গায় সবুজ বনের রহস্যে ঘেরা সুন্দর স্থান। বিরাট ব্যারাকে আছে সৈন্যরা। শিখছে মেশিন গান, মরটার ও হ্যাণ্ডগ্রেনেড চালনা। বিমান ও ট্যাঙ্ক ঘায়েল করার কৌশলও আয়ত্ত করছে।

সবচেয়ে বড় কথা হল তারা নিজের দেশকে ভালবাসতে শিখেছে। ইংরেজের ফৌজে থেকে তারা এসব কিছুই জানত না। জানত

শুধু—যুদ্ধ করতে হবে আর মরতে হবে। স্বাধীনতার মর্ম তারা কিছুই বুঝত না। আজ তারা স্বাধীনতার মর্ম বুঝতে পেরেছে। যদি যুদ্ধ করতে হয় দেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করবে, যদি মরতে হয় তবে দেশের স্বাধীনতার জন্যই মরবে। এই গৌরব যে সবচেয়ে বেশী।

এখন আর কারুর মধ্যে কোন বিভেদ নেই। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, শিখ, বাঙালী, মারাঠী, পাঞ্জাবী সবাই এক। সবারই একমাত্র পরিচয় আজাদ-হিন্দ্ ফৌজ, সবারই কণ্ঠে এক ধ্বনি—জয় হিন্দ্।

কাজের অন্ত নেই নেতাজীর। দিনের মধ্যে লিখতে হয় অসংখ্য চিঠি। বক্তৃতা তৈরি করতে হয়। লিখতে হয় প্রবন্ধ আজাদ-হিন্দ্ সংঘের মুখপত্রের জন্য। শুধু ইংরেজীতে নয়, জার্মান ভাষাতেও। বিনা ঘুমেই কেটে যায় কত রাত।

মন পড়ে থাকে ভারতবর্ষের দিকে। দেশের চিন্তায় থাকে মন নিবদ্ধ। স্বাধীন ভারতবর্ষকে গড়ে তুলতে হবে যে নূতন করে।

সময় পেলেই নেতাজী ছুটে যান হামবুর্গে। সেখানকার সংগ্রহশালা দেখেন। বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে করেন আলোচনা। ভারতীয় কৃষি এবং নানা ধরনের শিল্প সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হয়।

যান হল্যাণ্ডে, ডেনমার্কে, রুমানিয়ায়। ঘুরে ঘুরে দেখেন ছোট-বড় অনেক ফার্ম। ভারতবর্ষের শ্রীবৃদ্ধি কেমন করে ত্বরান্বিত হবে সেই চিন্তা সব সময়েই ঘুরতে থাকে সুভাষচন্দ্রের মাথায়।

জাপানের ব্রহ্মদেশ আক্রমণের পর থেকেই নেতাজীর চিন্তা ঘুরে যায় অন্য পথে। মান্দালয়······আরাকান······আকিয়াব······ ভারতবর্ষের মাটির সঙ্গে ছোঁয়া।

চঞ্চল হয়ে উঠে মন।

জার্মানীতে কেটে গেল অনেক দিন। এখানে থেকে আর কোন



জাপানের রিয়ার এ্যাড্‌মিরাল নেতাজীকে অভিবাদন জানাচ্ছেন।

সুবিধা হবে বলে মনে হয় না। ওদিকে যুদ্ধের চাকা যাচ্ছে ঘুরে। রাশিয়ায় হিটলার ধীরে ধীরে পশ্চাদপসরণ করছেন। রাশিয়া আক্রমণ করে ভুল করেছিলেন হিটলার। সেই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত বুঝি শুরু হচ্ছে এবার।

অস্থির হয়ে উঠলেন নেতাজী। দেখা করলেন জাপানের রাষ্ট্রদূত জেনারেল ওসিমার সঙ্গে।

সাক্ষাতের ফল অবিলম্বেই ফলল। জাপান থেকে এল সুভাষের ডাক।

জার্মানী থেকে কিন্তু খুব সহজেই নেতাজীর চলে যাওয়া সম্ভব হল না। হিটলার রাজী হলেন না প্রথমতঃ। আমেরিকা ক্রমশঃ শক্তিসঞ্চয় করছে। মিত্রপক্ষের আত্মনির্ভরতার পক্ষে সাহায্য করছে ভারতবর্ষের রসদ। এদিকে রাশিয়ায় বিপর্যয় শুরু হয়েছে জার্মানীর। এ সময়ে কি সুভাষচন্দ্রকে হাতছাড়া করা চলে?

কিন্তু এ ব্যাপারে সব চেয়ে বেশী সাহায্য করলেন ট্রট। তিনি ছিলেন নেতাজীর সত্যিকার হিতাকাঙ্ক্ষী। অনেক ব্যাপারেই তিনি সাহায্য করেছিলেন নেতাজীকে।

হিটলারকে অনেক বোঝালেন ট্রট। জাপানকে হিটলার বিশেষ কোন সাহায্য করতে পারেননি। অথচ মিত্রপক্ষের লোকবল ও সামরিক প্রচেষ্টা এশিয়ায় আটকে রাখা জার্মানীর স্বার্থেও বিশেষ প্রয়োজন। হিটলারের উচিত জাপানের অনুরোধ রক্ষা করা, সুভাষচন্দ্রকে অবিলম্বে সেখানে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া।

অনুমতি পাওয়া গেল।

কিন্তু আর এক সমস্যা সুভাষচন্দ্রের সম্মুখে। এত সাধ করে এখানে গড়ে তুলেছেন আজাদ-হিন্দ্ সংঘ আর আজাদ-হিন্দ্ ফৌজ। এসব ফেলে কি করে যাবেন?

তবে একথাও ঠিক, জার্মানীতে তিনি যা করবার সুযোগ পাননি

—তার সুযোগ নিশ্চিতভাবে পাওয়া যাবে জাপানে গেলে। বার্মায় তখন এগিয়ে চলেছে জাপানী ফৌজ।

সময় নেই। দেরি করলে সব কিছু ব্যর্থ হয়ে যাবে।

চলার গতিপথ চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

পড়ে রইল জার্মানীতে আজাদ-হিন্দ্ বাহিনী। পড়ে রইলেন হিতাকাঙ্ক্ষী ও সহযোগী বন্ধুরা। সময় পেলে সবাই গিয়ে দাঁড়াবে তাঁর পাশে।

আটই ফেব্রুয়ারী, উনিশশো তেতাল্লিশ। জার্মান-সাবমেরিনে চড়ে বসলেন নেতাজী। সঙ্গে একটি মাত্র লোক। আবিদ হাসান।

জল কেটে সাবমেরিন ছুটে চলল। জলকল্লোলে নূতন যাত্রার পদধ্বনি। ঘুমন্ত রাজকন্যাকে জাগাবার জন্য এ যেন পাতালপুরী অভিযান।

পার হয়ে চলল মাদাগাস্কার। এবার যাত্রা বদল। জার্মান সাবমেরিন থেকে জাপানের সাবমেরিনে।

তিনটি মাসের কী দুঃসহ সাগরতলের নিরুদ্ধ জীবন! শোয়া দূরে থাক—পা টান করে বসবার জায়গা পর্যন্ত মেলেনি।

তিনটি মাস অতন্দ্র প্রহরীর মত কাটিয়েছেন নেতাজী আর হাসান। পেরিস্কোপের সাহায্যে কাচের ভিতর দিয়ে নজর রেখেছেন চারদিকে।

আকাশে ঝাঁকে ঝাঁকে শত্রুর বিমান উড়ছে। জলের নীচে ঘুরছে শত্রুর সাবমেরিন। ছুটছে টর্পেডো—পাতা আছে মাইন। ডেস্ট্রয়ার আর ক্রুজারের অন্ত নেই। বিপদ্ আর মৃত্যু ঘুরে বেড়াচ্ছে পদে পদে।

চিন্তায় বিব্রত নেতাজী। তিনমাস দাড়ি কামাতে পারেননি। দাড়ি গোঁফের জঙ্গলে ভরে গেছে মুখ। সেই মুখের উপর ভেসে উঠেছে চিন্তার তরঙ্গ।

ভাবছেন জাপানের কথা। বিপ্লবী রাসবিহারী বসু আছেন ওখানে। তিনিও দেখছেন ভারতবর্ষের স্বাধীনতার স্বপ্ন। গড়ে তুলেছেন তিনিও আজাদ-হিন্দ্ বাহিনী।

সাবমেরিন এসে থামল সুমাত্রায়। সেখান থেকে নেতাজী জাপান যাত্রা করলেন বিমানে। টোকিওতে পৌঁছলেন তেরোই জুন।

এবার তাঁর সঙ্গী বিপ্লবী রাসবিহারী।

দোসরা জুলাই নেতাজী সিঙ্গাপুরে গিয়ে পৌঁছলেন। পরম আগ্রহে সেখানে তাঁর প্রতীক্ষায় ছিলেন ভারতবাসীরা। তাঁর আগমনে বিপুল সাড়া পড়ে গেল।

সিঙ্গাপুরে ক্যাথে বিল্ডিং-এ হল সভার আয়োজন। তিলধারণের জায়গা নেই সেখানে। সিঙ্গাপুরের সমস্ত ঘর যেন ফাঁকা করে সবাই চলে এসেছে নেতাজীকে দেখবার জন্য। এসেছে ভারতবাসী, মালয়বাসী, জাপানী ও চীনা। আর এসেছে জাতীয় বাহিনীর সৈনিকেরা।

চৌঠা জুলাই। রাসবিহারী তুলে দিলেন পূর্ব এশিয়ার আজাদ-হিন্দ্ সংঘ আর ফৌজ নেতাজীর হাতে। ত্রিশ লক্ষ ভারতবাসী সানন্দে বরণ করে নিল তাদের নেতাজীকে।

জয় হিন্দ্!

সেদিনই নেতাজী অস্থায়ী স্বাধীন ভারত সরকার গঠনের সংকল্প ঘোষণা করলেন। সবাই চমকে উঠল সেই ঘোষণা শুনে।

ভারতের বাইরে গড়ে উঠবে একটি জাতীয় সরকার। সেই সরকার পরিচালনা করবে স্বাধীন ভারতকে। ইংরেজকে বাধ্য করবে ভারত ছেড়ে চলে যেতে। ভারতে যে ধ্বনি উঠেছে—'ইংরেজ ভারত ছাড়ো'—সেই সুরে কণ্ঠ মেলাবে এই আজাদ-হিন্দ্ সরকার। অগ্রাহ্য করবে ইংরেজের কর্তৃত্বকে।

জয় হিন্দ্! নেতাজী কি জয়! মিলিত কণ্ঠের জয়ধ্বনিতে আকাশ বাতাস কেঁপে উঠল।

পরের দিন। নেতাজী গ্রহণ করছেন আজাদ-হিন্দ্ ফৌজের অভিবাদন। অগণিত দর্শক উৎসুক নয়নে দেখছে সেই বিচিত্র দৃশ্য।

মঞ্চে উঠে নেতাজী বললেন—"ভারতের স্বাধীনতার সেনাদল! আমার জীবনের আজ সবচেয়ে বড় গর্বের দিন। একথা ঘোষণা করতে পেরে আমি ধন্য যে, ভারতবর্ষ তার মুক্তি ফৌজ গড়ে তুলেছে। এই সিঙ্গাপুরেই একদিন ইংরেজের দুর্ভেদ্য দুর্গ ছিল। আর আজ এই সিঙ্গাপুরের রণক্ষেত্রেই আজাদ-হিন্দ্ ফৌজ সামরিক প্রস্তুতি নিয়ে সজ্জিত।

"কমরেডস, আমার নির্ভীক মুক্তি-সৈনিক, আজ তোমাদের কণ্ঠে একটি মাত্র ধ্বনি গর্জে উঠুক,—'দিল্লী—চলো দিল্লী'। আমি জানি না আমাদের মধ্যে ক'জন এই সংগ্রামের পরে বেঁচে থাকবে। তবে একথা আমি জানি, জয় আমাদের সুনিশ্চিত। প্রাচীন দিল্লীর লাল কেল্লায় বিজয়োৎসব সম্পন্ন না করা পর্যন্ত আমাদের কর্তব্য শেষ হবে না।

"আজ আমি রিক্ত। দেবার আমার কিছু নেই। শুধু তোমাদের দিতে পারব অনাহার, বুকফাটা পিপাসা, অনন্ত দুঃখ, অনিশ্চিত অজানা পথের অপরিমেয় কষ্ট আর মৃত্যু।

"পরাধীন জাতির পক্ষে স্বাধীনতা সংগ্রামের সৈনিক হওয়ার চেয়ে বড় সম্মান ও গৌরবের বিষয় আর কিছু নেই। কিন্তু এই সম্মানের সঙ্গে দায়িত্বও রয়েছে এবং সেই দায়িত্ব সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ সচেতন। দৃঢ়তার সঙ্গে আমি ঘোষণা করছি—আলোকে এবং অন্ধকারে, দুঃখে এবং সুখে, পরাজয়ে এবং বিজয়ে আমি সর্বদা তোমাদের পাশে পাশে থাকব।

জয় হিন্দ্।"

পরদিন জাপানের প্রধান মন্ত্রী তোজো এলেন সিঙ্গাপুরে। একসঙ্গে দু'টি স্বাধীন রাষ্ট্রের নায়ক দাঁড়ালেন পাশাপাশি। দুই রাষ্ট্রের জাতীয় পতাকা একসঙ্গে উড়ল আকাশে। জাপানের প্রধানমন্ত্রী গ্রহণ করলেন আজাদ-হিন্দ্ ফৌজের গার্ড-অব-অনার।

চারদিকে বিপুল সাড়া।

এগিয়ে এলেন নারীর দল। প্রবাসী ভারতীয় নারীরাও যোগদান করতে চান ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে।

এলেন ডাঃ লক্ষ্মী স্বামীনাথন। সাহসিকা নারী। বললেন—"আমাকে কাজের ভার দিন নেতাজী।"

নেতাজী চমকে উঠলেন—"আপনি কী কাজ করবেন? সেবার কাজ?"

"হ্যাঁ, দেশসেবা। যুদ্ধ!"

"যুদ্ধ!"

"হ্যাঁ, নারীরা কি শুধু সেবার কাজই জানে? তারা যুদ্ধ করতে জানে না? ভারতীয় নারীরা কি যুদ্ধ করেনি শত্রুর সঙ্গে?"

নেতাজী স্তম্ভিত! মুগ্ধ!

বিস্ময়ে তাকালেন লক্ষ্মী স্বামীনাথনের দিকে। ভারতীয় বীর নারীর জীবন্ত প্রতীক।

চিকিৎসাকার্যে এতকাল রত ছিলেন লক্ষ্মী স্বামীনাথন। এবার এগিয়ে এলেন স্বদেশের মুক্তি-সংগ্রামে।

গঠিত হল ঝান্সীর রানী-বাহিনী। প্রথমেই এগিয়ে এলেন একশো ছাপ্পান্ন জন নারী। তাঁদের অস্ত্রশিক্ষা দানের ব্যবস্থা হল।

যুদ্ধ! ভারতের স্বাধীনতা না আসা পর্যন্ত এ যুদ্ধ থামবে না। দিনের পর দিন বেড়েই চলবে তার প্রস্তুতি।

নেতাজী গঠন করলেন বাল-সেনাদল। আত্মঘাতী সেনারূপে এরা থাকবে সমর-বাহিনীতে।

এদের প্রধান কাজ হবে শত্রুর ট্যাঙ্ক ধ্বংস করা। পিঠে মাইন বেঁধে আচমকা এরা শত্রুর ট্যাঙ্কের তলায় শুয়ে পড়বে। তাতে ট্যাঙ্কগুলি ধ্বংস হয়ে যাবে কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে তাদের দেহও যাবে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে।

মৃত্যুর পায়ে জীবন বিলিয়ে দেবার জন্য কী উৎসাহ তরুণদের।

এগিয়ে চলে আজাদ-হিন্দ্ সেনাবাহিনী। ফরওয়ার্ড মার্চ। ধ্বনিত হয় আজাদ হিন্দ্-এর জাতীয় সংগীত—

কদম কদম বঢ়ায়ে জা
খুসীসে গীত গায়ে জা,
জিন্দ্গী হৈ কৌম্ কী
কৌম্ পৈ লুটায়ে জা।

তূ শেরে হিন্দ আগে বঢ়
মরনেসে ফিরভী তূ ন ডর
আসমান তক উঠাকে সির
জোশশে বতন বঢ়ায়ে জা।

তেরী হিম্মত বঢ়তী রহে,
খুদা তেরে স্থনতে রহে
জো সামনে তেরে চঢ়ে
তো খাক মেঁ মিলায়ে জা।

চলো দিল্লী পুকারকে
কৌমী-নিশান সামালকে
লালকিল্লে পৈ গাড়কে
লহ্রায়ে জা লহ্রায়ে জা।

অক্টোবর মাসের একটি স্নিগ্ধ সকাল।

নেতাজী এগিয়ে চলেছেন সভামঞ্চের দিকে। বিরাট সভা। সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া যেন ভেঙে পড়েছে সভাস্থলে।

ভাবতে ভাবতে চলেছেন নেতাজী। ভাবছেন ভারতবর্ষের কথা। বাংলার কথা। বাংলায় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে। নেতাজী আজাদ-হিন্দ্ সরকারের নামে এক লক্ষ টন চাল পাঠাতে চেয়েছিলেন বাংলায়। রেডিও মারফত ইংরেজের সাহায্য কামনা করেছিলেন। ইংরেজ তাতে রাজী হয়নি, উলটে তাঁকে করেছে কুৎসিত ভাষায় গালাগালি।

তা তো করবেই। ওই দুর্ভিক্ষ যে ইংরেজেরই সৃষ্টি। বাংলার জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনকে দমিয়ে রাখার জন্য একটা জঘন্য চক্রান্ত।

সভামঞ্চে উঠে দাঁড়ালেন নেতাজী। দৃপ্তকণ্ঠে বললেন—"আমি সুভাষচন্দ্র বসু ভগবানের নামে শপথ করে বলছি যে, আমার মাতৃভূমি ভারতবর্ষ এবং আটত্রিশ কোটি দেশবাসীর স্বাধীনতা অর্জন করবার জন্য আমি জীবনান্ত পর্যন্ত সংগ্রাম চালিয়ে যাব।

"চিরদিন আমার জীবন হবে ভারতের সেবকের জীবন। ভারতবর্ষে নরনারীর শুভ ও কল্যাণ-কামনা হবে আমার ব্রত, আমার জীবনের মহোত্তম ধর্ম।"

একে একে আজাদ-হিন্দ্ সরকারের মন্ত্রীরা এগিয়ে আসেন। শপথ গ্রহণ করেন ভগবান ও জন্মভূমির নামে। নতজানু হয়ে আনুগত্য জানান তাঁদের অধিনায়ক নেতাজীর সম্মুখে।

এগিয়ে আসেন ক্যাপ্টেন মিস্ লক্ষ্মী স্বামীনাথন, নারী বাহিনীর অধিনেত্রী। এগিয়ে আসেন এস, এ, আয়েঙ্গার, প্রচার মন্ত্রী। এগিয়ে আসেন লেফটেন্যাণ্ট কর্নেল এ, সি, চ্যাটার্জী, অর্থমন্ত্রী। সেনাবাহিনীর অধ্যক্ষ লেফটেন্যাণ্ট কর্নেল শা নওয়াজ এগিয়ে আসেন। এগিয়ে

আসেন অন্যান্য সদস্যগণ এস, এস, ভগৎ, জে, কে, ভোঁসলে, গুলজার সিং, এম, জেড, কিয়ানি, এ, ডি, লোকনাথন, ঈশান কাদির, আজিজ আমেদ। এঁরা সবাই লেফটেন্যান্ট কর্নেল। এগিয়ে আসেন এ, এম, সহায়। তিনি সেক্রেটারী হলেও তাঁর পদমর্যাদা মন্ত্রীর মত।

আজাদ-হিন্দ্ সরকারের সর্বোচ্চ পরামর্শদাতা রয়েছেন রাসবিহারী বসু, আইন বিষয়ক পরামর্শদাতা এ, এন, সরকার। অন্যান্য পরামর্শদাতারা হলেন করিম গনি, দেবনাথ দাস, ডি এম খান, এ ইয়েলাপ্পা, আই খিবি ও সর্দার ঈশ্বর সিং।

বিরাট শক্তিসম্পন্ন ও মর্যাদাসম্পন্ন আজাদ-হিন্দ্ গভর্নমেণ্ট। একটি পূর্ণাঙ্গ জাতীয় সরকার। এই সরকারকে স্বীকৃতি জানাল জাপান। তারপর ইতালী, জার্মানী, ক্রোটিয়া, বার্মা, থাইল্যাণ্ড, চীন, ফিলিপাইন ও মানচুরিয়া এই সরকারকে সমর্থন করল। একটি বিধিসম্মত রাষ্ট্রের মর্যাদা নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হল অস্থায়ী আজাদ-হিন্দ্ সরকার উনিশশো তেতাল্লিশ সালের ২১শে অক্টোবর তারিখে।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রবাসী ভারতীয়দের মধ্যে দেখতে দেখতে এসে গেল প্রাণের জোয়ার। ছেলে-বুড়ো, নর-নারী সবার মধ্যেই এক নূতন প্রাণের স্পন্দন জেগে উঠল।

স্বদেশ থেকে দূরে এসে এতদিন তারা শুধু নিজেদের ব্যবসা-বাণিজ্য আর টাকাকড়ি নিয়ে ব্যস্ত ছিল। দেশের কথা ভাবতো বটে, তাতে কোন আকুলতা ছিল না। নেতাজী আসার সঙ্গে সঙ্গে তাদের সকলের মনের মধ্যে বিরাট পরিবর্তন এসে গেল। সবাই যেন সর্বস্ব দেবার জন্য হয়ে উঠল ব্যাকুল।

বিরাট আজাদ-হিন্দ্ বাহিনী পরিচালনা করতে অর্থ চাই—প্রচুর অর্থ।

নেতাজী আবেদন জানালেন প্রবাসী ভারতীয়দের কাছে। পাওয়া গেল বিপুল সাড়া।

"যার যা সাধ্য দান কর আমাকে। আমি ভিক্ষা চাইছি দেশের জন্য—মাতৃভূমির স্বাধীনতার সংগ্রামের জন্য।"

মেয়েরা গলার হার খুলে দেয়, খুলে দেয় হাতের চুড়ি। পুরুষরা পকেট থেকে তুলে দেয় তাদের সম্বল। খুলে দেয় সোনার আংটি।

সবাই মন উজাড় করে দিয়ে দান করে। এক একটি সভায় এমনি করে সংগ্রহ হয় লক্ষ লক্ষ টাকা।

একদিন এক সভায় বক্তৃতার পর নেতাজী ভিক্ষার আবেদন জানালেন। দেখতে দেখতে হাজার হাজার টাকা জড়ো হতে লাগল। মেয়েরা খুলে দিতে লাগলেন গায়ের গয়না। এমন সময় নেতাজী দেখলেন, ছেঁড়া ময়লা কাপড় পরা এক বৃদ্ধা ভিখারিনী তাঁর দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে।

একবার এগোচ্ছে—একবার পেছোচ্ছে। ভয় ও সংকোচ নেই সেই ভিখারিনীর চোখে মুখে।

নেতাজী তাকে কাছে ডাকলেন। এগিয়ে এসে বৃদ্ধা ভিখারিনী তার ছেঁড়া কাপড়ের ভেতর থেকে বের করল দুটো টাকা। সংকুচিত ভাবে বলল—"আমি গরিব ভিখারী, ভিক্ষা করে এই টাকা দুটো জমিয়েছিলাম। তুমি কি নেবে বাবা আমার এই সামান্য দান?"

আগ্রহে হাত পেতে বৃদ্ধার সেই দু'টি টাকা নিলেন নেতাজী। বললেন—"মাগো, তোমার এই দু'টি টাকা শ্রেষ্ঠ দান হয়ে আমার থলিতে রইল।"

॥ ২৩ ॥

পঁচিশে অক্টোবর, উনিশশো তেতাল্লিশ।

অস্থায়ী আজাদ-হিন্দ্ সরকার ব্রিটেন ও আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। জয়-হিন্দ্, ইনক্লাব জিন্দাবাদ, নেতাজী জিন্দাবাদ ধ্বনিতে কেঁপে উঠল আকাশ বাতাস।

স্বাধীন ভারতবর্ষের নামে এই প্রথম সংগ্রাম-ঘোষণা।

নেতাজী এসে দাঁড়ালেন ধীর পায়ে। পরনে খাকি রঙের সামরিক পোশাক। পায়ে হাঁটু অবধি বুট। মাথায় সৈনিকের টুপি।

বিউগ্ল বেজে উঠল।

নেতাজী ঘোষণা-বাণী পাঠ করলেন—চলো দিল্লী।

সৈনিক-বাহিনী উঁচু করে তুলে ধরল হাতের রাইফেল। ঝকঝক করে উঠল রাইফেলের মাথার শাণিত কিরিচ।

চলো দিল্লী।

এবার এগিয়ে যেতে হবে ভারতবর্ষের দিকে।

জাপান করে দিয়েছে পথ। সেই পথ দিয়ে লড়াই করতে করতে এগিয়ে যেতে হবে।

নেতাজী বিমানে চেপে চলে গেলেন টোকিওতে। সেখানে বসছে বৃহত্তর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সম্মেলন। তাতে তিনি যোগ দেবেন।

সেখানে গিয়ে দেখা হল জাপানের প্রধানমন্ত্রী জেনারেল তোজোর সঙ্গে। জাপানের দখলে তখন আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপ। তোজো বললেন—"প্রীতির নিদর্শনস্বরূপ এই দ্বীপ দু'টি আজাদ-হিন্দ্ সরকারকে দান করলাম।"

নেতাজী আনন্দিত। এই সর্বপ্রথম স্বাধীন ভারত সরকারের হাতে এল ব্রিটিশ শাসনমুক্ত ভারতীয় ভূখণ্ড।

উনিশশো তেতাল্লিশ সালের নভেম্বর মাস। রৌদ্রঝলমল একটি চমৎকার দিন।

ম্যানিলার সমুদ্রোপকূলে লুনেটা পার্কে নেতাজী গেলেন জোস্ রেজলের মর্মর-মূর্তিতে মাল্যদান করতে। ফিলিপাইনের প্রসিদ্ধ কবি জোস্ রেজল আদর্শ দেশপ্রেমিক ও মুক্তিসংগ্রামের শহীদ।

মূর্তির পাদদেশে শত শত ভারতীয়ের এক বিপুল জনতা নেতাজীকে ঘিরে ধরল। এরা ম্যানিলা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের অধিবাসী। জনতা জয়-হিন্দ্ ধ্বনিতে সুভাষচন্দ্রকে জানাল তাদের অভিনন্দন। ফোটোগ্রাফাররা ফোটো তুলবে—সুভাষচন্দ্র দাঁড়ালেন জনতার সঙ্গে।

ফোটো নেওয়া শেষ হল। কেটে গেল অনেকক্ষণ। সুভাষচন্দ্র নড়েন না, জনতাও নিস্তব্ধ। গভীর নীরবতার মধ্যে পলকহীন দৃষ্টিতে তিনি জোস্ রেজলের মূর্তির দিকে তাকিয়ে রইলেন।

সেদিন তাঁর কী মহিমময় রূপ! স্বাধীন ভারতের প্রতীক আঁকা আজাদ-হিন্দ্ পতাকা উড়ছে বাতাসে। বিরাট মূর্তির পাদদেশে সুভাষচন্দ্রের দেওয়া ফুলের রাশি। বিপ্লবী শহীদের মূর্তির দিকে তাকিয়ে নেতাজী কি যেন ভাবছেন—ভাবছেন হয়তো ভারতের বীর শহীদদের কথা। দেখতে দেখতে দু'চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। পরক্ষণেই অশ্রুসজল হয়ে উঠছে দু'চোখ।

নেতাজী আন্দামানে গেলেন তিরিশে ডিসেম্বর। আজাদ-হিন্দ্ সরকারের সর্বাধিনায়ককে বিপুল অভ্যর্থনা জানাল আন্দামানবাসীরা।

আন্দামান থেকে ব্যাঙ্কক হয়ে নেতাজী পৌঁছলেন রেঙ্গুনে। তখন পুরনো বছর শেষ হয়ে শুরু হয়েছে নতুন বছর—উনিশশো চুয়াল্লিশ সাল।

আজাদ-হিন্দ্ সরকার ও ফৌজের একটি হেডকোয়ার্টার খোলা হল রেঙ্গুনে। রেঙ্গুন থেকে ভারত সীমান্ত বেশী দূরে নয়। এখান থেকে সৈন্য পরিচালনা করা অনেক সহজ।

আজাদ-হিন্দ্ সরকারের রিয়ার হেডকোয়ার্টার্স হল সিঙ্গাপুরে। তার শাখা খোলা হল অনেক জায়গায়—মালয়, সুমাত্রা, জাভা, বোর্নিও, শ্যাম, আন্দামান, সেলিবিস, চীন, মাঞ্চুরিয়া ও জাপানে।

বার্মায় আসার পর থেকেই আজাদ-হিন্দ্ সরকারের কার্যকলাপ আরও ব্যাপক হয়ে উঠল। রেঙ্গুনই হয়ে উঠল আজাদ-হিন্দ সরকারের অস্থায়ী রাজধানী ও প্রধান কর্মস্থল।

এবার শুরু হল অভিযান।

নেতাজী উদ্দীপনা জাগিয়ে তুললেন সেনানীদের মনে। জলদ-গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—"ঐ যে দূরের নদী বন পর্বত, ওরই ওপারে রয়েছে আমাদের চিরপ্রিয় মাতৃভূমি। ওরই কোলে আমরা জন্মেছি। ওরই কোলে এবার আমরা ফিরে যাবো।

"শোনো শোনো, মা আমাদের ডাকছেন। ডাকছে ভারতবর্ষের রাজধানী দিল্লী। আর ডাকছে কোটি কোটি ভারতবাসী।…হাতে অস্ত্র নাও। তোমাদের সম্মুখে ঐ প্রসারিত পথ,—মুক্তির পথ, তৈরি করে গেছেন আমাদের পূর্বগামীরা। ঐ পথ ধরে আমরা এগিয়ে যাবো, শত্রুর ব্যূহ ভেদ করে আমরা আমাদের লক্ষ্যের পথে অগ্রসর হবো। অথবা ভগবানের নির্দেশে আমরা করে নেবো শহীদের মৃত্যু বরণ।

মায়ের কোলে অন্তিম ঘুমে ঢলে পড়বো আমরা তাঁর পায়ের মাটি চুম্বন করে। যারা বেঁচে থাকবে তারা গিয়ে দখল করে নেবে দিল্লী।

"দিল্লীর পথই স্বাধীনতার পথ। চলো দিল্লী।"

ফৌজ ও সংঘের অধিকাংশ লোকই ছিল নেতাজীর চেয়ে বয়সে কম। কিন্তু কাজে ওঁর সঙ্গে পাল্লা দেবার জুড়ি কেউ ছিল না। বিশ্রাম করতেন সবার চেয়ে কম, কাজ করতেন সবার চেয়ে বেশী।

দুপুরে খাওয়ার পর একটুখানি ঝিমুনি আসত। কোন কোন দিন চেয়ারে বসেই ঘুমিয়ে নিতেন একটু। আবার কখনও গড়িয়ে নিতেন শয্যায়। তাও অল্পক্ষণ। আধ ঘণ্টাও নয়। কাজের পর কাজ পড়ে আছে সামনে।

রাতের খাওয়ার পর এক কাপ কফি চাই। কফি এক কাপ হলে কাজ চলবে অন্ততঃ রাত একটা পর্যন্ত। দু' কাপ হলে বুঝতে হবে সেদিন কাজের তাড়া আরও বেশী।

রেঙ্গুন ক্যাম্পের খাস ভৃত্য কুন্দন সিং। কুন্দন সিংকে কোন কোন দিন বেশি করে কফি টেবিলে রাখবার হুকুম দিতেন। সেদিন অনুমান করতে অসুবিধা হত না—নেতাজী কাজ করবেন সারা রাত।

বর্মা রক্ষার জন্য শেষ চেষ্টা করছে ইংরেজ। জাপানও বেপরোয়া।

হকোয়াং উপত্যকায় ইংরেজের আক্রমণ এবং তাদের চিন্দুইন নদী অতিক্রমের সম্ভাবনায় জাপানীরা অধীর হয়ে পড়ল। তাড়াহুড়া করে তারা করে ফেলল এক পরিকল্পনা। ইম্ফল দখল করবার জন্য অবিলম্বে অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন, কিন্তু আজাদ-হিন্দ্ ফৌজ জাপানীদের ভারত আক্রমণের অধিকার কিছুতেই স্বীকার করল না।

নেতাজী দৃপ্তকণ্ঠে বললেন—"পরাধীন ভারতবর্ষকে স্বাধীন করবে কারা? ভারতবর্ষের পুত্র ও কন্যারা। তারাই দেবে প্রয়োজনীয় অর্থ, সামর্থ্য আর হৃৎপিণ্ডের রক্ত।

"আমি জাপানীদের কাছে নতজানু হয়ে ভিক্ষা চাইতে যাবো

না···স্বাধীনতা কোনদিন কোন দেশে সহজে আসেনি। যে স্বাধীনতা আসে সহজে, তা যায়ও সহজেই। যে স্বাধীনতা অন্যে কৃপা করে দেয়, কেড়েও নিতে জানে সে অবহেলায়।"

অগত্যা সুস্পষ্টভাবে জাপানীদের নীতি ঘোষণা করতে হল। তারা কেবল ইম্ফলই দখল করবে। তারপর ভারত আক্রমণের সমস্ত সামরিক কার্যকলাপ ছেড়ে দেবে আজাদ-হিন্দ্ ফৌজের উপর।

তবু ইম্ফল যুদ্ধে আজাদ-হিন্দ্ বাহিনীকেই প্রধান অংশ নিতে হল। তিনটি সুগঠিত সামরিক বাহিনী করল বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম। কর্নেল শা নওয়াজের নেতৃত্বে ৬২০০ সৈন্য নিয়ে গঠিত 'সুভাষ-ব্রিগেড', কর্নেল ইনায়াৎ কয়ানির নেতৃত্বে ২৮০০ সৈন্য নিয়ে 'গান্ধী ব্রিগেড' আর প্রায় তিন হাজার সৈন্য নিয়ে কর্নেল মোহন সিংহের নেতৃত্বে 'আজাদ-ব্রিগেড'।

তা ছাড়াও আছে তিনশো বাহাদুর দলের ফৌজ। সাতশো বেসামরিক সাহায্যকারীও আছে তাদের সঙ্গে। তাদের পিছনে রয়েছে গুরুবক্স সিং ধীলনের নেতৃত্বে তিন হাজার সৈন্য নিয়ে 'নেহরু-ব্রিগেড'।

'কদম কদম বঢ়ায়ে জা'—

নেতাজী বললেন—"তোমরা আমাকে দাও তোমাদের রক্ত, আমি তোমাদের এনে দেব স্বাধীনতা। এগিয়ে চলো······"

ঘন জঙ্গলের মধ্যে ব্রিটিশ বাহিনীর সঙ্গে চলতে লাগল আজাদ-হিন্দ্ ফৌজের অবিরাম সংগ্রাম।

নিজে রণক্ষেত্র ঘুরে তদারক করছেন সিপাহ্‌শালার সুভাষচন্দ্র।

দলে দলে সৈন্য প্রাণ দিচ্ছে। আহত হচ্ছে প্রচুর সৈন্য। তাদের চিকিৎসার জন্য বনের ভেতব গড়ে উঠেছে সামরিক হাসপাতাল।

নেতাজী সেই হাসপাতালে প্রত্যেক সৈনিকের কাছে গিয়ে দাঁড়াচ্ছেন। খবর নিচ্ছেন সব কিছুর। তাঁকে দেখে মুমূর্ষু আহত সৈনিকদের মৃত্যুযন্ত্রণার মাঝেও মনে উৎসাহ ফিরে আসছে।

একদিন হাসপাতাল পরিদর্শন করতে করতে যুদ্ধক্ষেত্রের কাছাকাছি এক হাসপাতালে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

হঠাৎ বেজে উঠল সাইরেন। শত্রুপক্ষের বিমান দেখা দিয়েছে। হয়তো এখনি এই শিবিরের উপর বোমা ফেলবে। নেতাজীর অনুচরেরা সকলেই তাঁর জীবন আশঙ্কায় চঞ্চল হয়ে উঠল। ব্যস্ত হয়ে উঠল তাড়াতাড়ি তাঁকে শেলটারে নিয়ে যাবার জন্য।

কিন্তু তাদের সেই ব্যস্ততা দেখে নেতাজী তাদের ভৎ´সনা করে উঠলেন। বললেন—"শুধু কি আমার বাঁচলেই চলবে? এদের জীবনের কোন দাম নেই?"

সেনানায়কের মত তিনি আদেশ করলেন, প্রত্যেক আহত সৈনিককে আগে শেল্‌টারে নিয়ে যেতে। নিজে সেখানে দাঁড়িয়ে থেকে সেই কাজে সাহায্য করতে লাগলেন।

কাছেই বোমা পড়ল। অনুচরেরা সকলেই বিচলিত হয়ে উঠল। কিন্তু নেতাজীর মধ্যে চাঞ্চল্যের কোন চিহ্ন নেই।

দেখতে দেখতে আশেপাশে বোমা পড়তে শুরু হল। সেই অগ্নিবর্ষণের মধ্যে দাঁড়িয়ে থেকে কর্তব্যপরায়ণ সৈনিকের মত নেতাজী নিজের কর্তব্য করতে লাগলেন। শেষ আহত সৈনিকটি সরিয়ে তবে তিনি আশ্রয় গ্রহণ করলেন।

এগিয়ে চলল আজাদ-হিন্দ্‌ বাহিনী বর্মা অভিমুখে।

লক্ষ্য কিন্তু ভারতবর্ষের দিকে। দিল্লী—দিল্লী তাদের পৌঁছতে হবে।

বর্মার ঘন জঙ্গল আর পাহাড় ভেদ করে এগিয়ে যাওয়া—কী কষ্টকর সেই অভিযান! পদে পদে বিপদের সংকেত।

এগিয়ে গিয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম। আবার যুদ্ধযাত্রা।

রাত্রে কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর ভোরবেলাতেই অভিযানের জন্য

প্রস্তুত হচ্ছে আজাদ-হিন্দ্ বাহিনী। সঙ্গে নেতাজী। প্রত্যেক সৈনিকের মত তিনিও তাঁর ব্যাগে সাতদিনের খাবার দিতে আদেশ করেছেন।

খাদ্যের তখন টানাটানি। তাই প্রত্যেক সৈনিকের দৈনিক খাদ্যের বরাদ্দ হল দু'খানা করে পোড়া রুটি।

যাত্রার আগে তিনি ব্যাগ খুলে দেখলেন তাঁর ব্যাগে রয়েছে ভালো রুটি। আর সংখ্যাতেও রয়েছে বেশী।

ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন নেতাজী। কে এমন কাজ করেছে? কে দিয়েছে এই রুটি? সৈনিক যা খেতে পারে সেনানায়ক কি তা পারে না?

তৎক্ষণাৎ তিনি সেই রুটি অন্য প্রয়োজনে রেখে দিয়ে সাধারণ সৈনিকের বরাদ্দ মতো পোড়া রুটি দু'খানা করে গুনে গুনে ব্যাগে নিলেন। একটাও বেশী নিলেন না।

বললেন—"এমনিভাবে দুঃখকে জয় করেই তো আমাদের এগিয়ে যেতে হবে।"

এগিয়ে চলল আজাদ-হিন্দ্ বাহিনী।

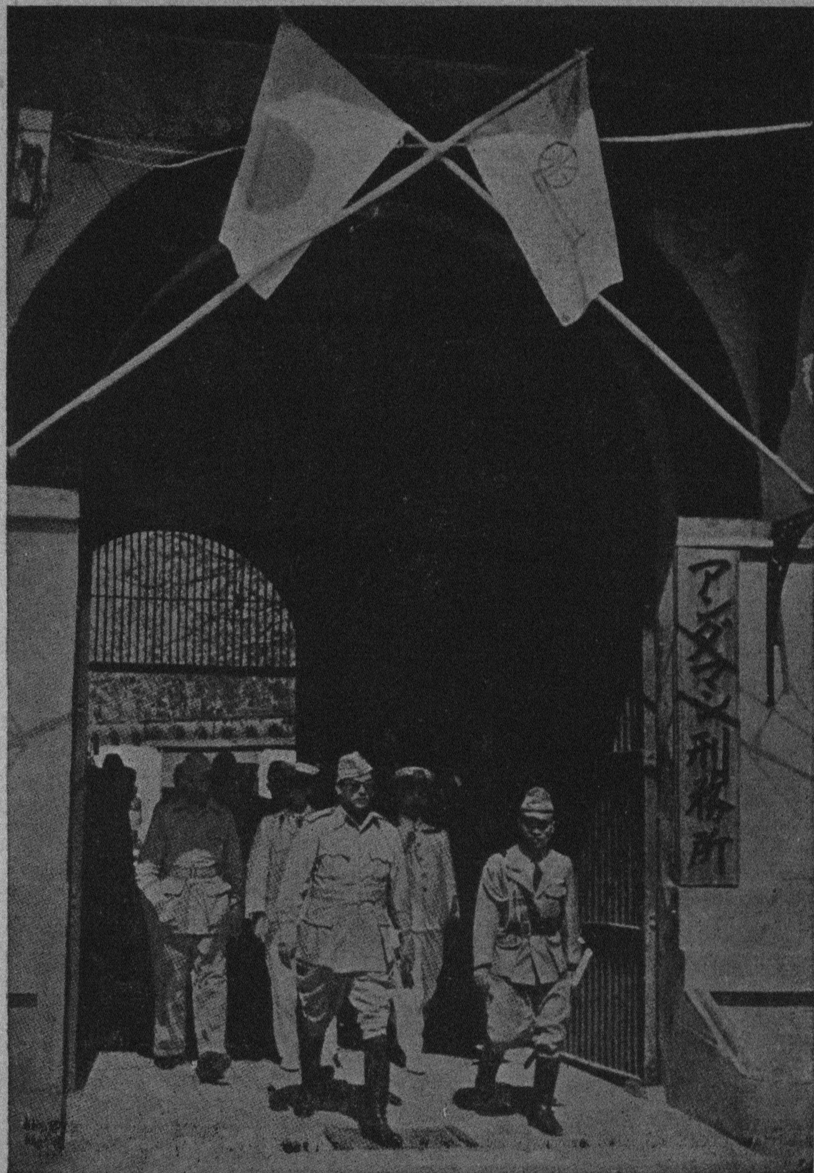
হঠাৎ একদিন ইংরেজ বেতারে ঘোষণা করল—শত্রুপক্ষ আরাকান ফ্রন্টে পিছু হটছে। এগিয়ে চলেছে মিত্রপক্ষের সৈন্য।

নেতাজী চিন্তিত—বিমর্ষ।

জয় পরাজয়ের হিসাব করলে এখন চলবে না। মৃত্যুকে তুচ্ছ করেই এগিয়ে যেতে হবে।

ইম্ফল লক্ষ্য করে এগিয়ে চলল আজাদী সৈন্য। বৃত্তাকারে এগিয়ে চলেছে তারা। হানা দিয়েছে একসঙ্গে আটটি কেন্দ্রে।

মোরাই আর কোহিমা আজাদী ফৌজের দখলে এসেছে। ভেঙে দিয়েছে ডিমাপুরের সড়ক। শত্রুর চলাচল স্তব্ধ হয়ে গেছে।



সেলুলর জেল পরিদর্শন করে নেতাজী বেরিয়ে আসছেন

সামনে প্যালেল বিমান-ঘাঁটি। ওটা দখল করতেই হবে। তারপর ?

এদিকে রসদ নিঃশেষ হয়ে গেছে। ঝাঁকে ঝাঁকে আসছে শত্রুর বিমান। আজাদী ফৌজের বিমান নেই। খাদ্য গেছে ফুরিয়ে। সরবরাহের সংযোগ গেছে ছিন্ন হয়ে।

জাপানীরা বিমান দিল না ট্রাক দিল না, এমনকি রসদও দিল না। পায়ে হেঁটে এগিয়ে চলল আজাদী সৈন্য।

গিয়ে পড়ল শত্রুর মুখোমুখি। এবার শুরু হল হাতাহাতি যুদ্ধ। হাতাহাতি যুদ্ধে আজাদী সৈন্যরা ওস্তাদ। শত্রুপক্ষ ভীত হয়ে পড়ে।

আরাকান ফ্রণ্ট থেকে ইংরেজ সৈন্যরা ছুটে এল। আসামের কোহিমা শহরের উপকণ্ঠে হল তুমুল লড়াই। শত্রু-আক্রমণ প্রতিহত হল।

আঠারই মার্চ, উনিশশো চুয়াল্লিশ। স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে দিনটি ইতিহাসের পাতায়। ইংরেজ ও আমেরিকার মিলিত বাহিনীকে পরাজিত করে আজাদ-হিন্দ্ ফৌজ ঢুকে পড়েছে ভারতের সীমানায়। চুম্বন করেছে ভারতের মাটি। সিঙ্গাপুরের ছোট একখানি ভূখণ্ড থেকে মালয়, থাইল্যাণ্ড পেরিয়ে বর্মার উপর দিয়ে আজাদ-হিন্দ্ ফৌজ পৌঁছে গেছে ভারতের বুকে।

আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ এখন শহীদ আর স্বরাজ দ্বীপ। জেনারেল লোকনাথনকে নিযুক্ত করা হল সেই দ্বীপ দুটির চিফ্ কমিশনার। আর কর্নেল চ্যাটার্জী নিযুক্ত হলেন শত্রুমুক্ত ভারতীয় ভূখণ্ডের প্রথম গভর্নর।

ওদিকে ইম্ফলের তিন মাইলের মধ্যে এসে গেল আজাদ-হিন্দ্ বাহিনীর একটি বিরাট অংশ। বিমান নেই, তবু আশ্চর্য তাদের

অগ্রগতি। খাদ্য নেই, রসদ নেই, নেই উপযুক্ত অস্ত্র। তবু লড়াই চলছে।

। এদিকে এসে গেল আকস্মিকভাবে বর্ষা। পার্বত্য এলাকার দুর্গম পথ হয়ে উঠল আরও দুর্গম। সংযোগ ব্যবস্থার ঘটল চরম বিপর্যয়। হাঁটাপথে এবং অল্প কয়েকটি ট্রাকে রসদ যোগানো অসম্ভব হয়ে উঠল।

নিরুপায় আজাদী সৈন্য দলে দলে মরল কিন্তু পিছু হটল না। শহীদের রক্তে ভিজে গেল বিষেণপুর আর প্যালেলের মাটি।

জলে তাঁবু ভেসে গেল। যা রসদ ছিল তাও গেল ভিজে নষ্ট হয়ে। চারদিকে কিলবিল করে কেঁচো, জোঁগ ও পোকা। রোগ দেখা দেয় ক্যাম্পে। ওষুধ নেই, পথ্য নেই।

এদিকে ইম্ফলের পরিস্থিতি দেখে শঙ্কিত হয়ে উঠেছিল মিত্রপক্ষ। বিলেতে বসেই আঁতকে উঠলেন চার্চিল।

তিনি বললেন—"যদি অবিলম্বে রিজার্ভ ফোর্স না পাঠানো হয় তাহলে মিটকিনা কিংবা ইম্ফল রক্ষা করা যাবে না।"

কিন্তু আকস্মিক বর্ষাই মিত্রপক্ষের জয়ের সূচনা করে দিল। আজাদী সৈন্যরা হয়ে পড়ল অবরুদ্ধ।

পিছু হটবার হুকুম এল।

ভারতের শেষ সম্রাট্ বাহাদুর শাহের সমাধিক্ষেত্রে হল বিজয়ী আজাদী সৈন্যের শেষ প্যারেড।

মৃত্যুর বুকে দাঁড়িয়েও তাদের মনে জয়লাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষা।

নতুন উদ্যমে দ্বিতীয় অভিযানের উদ্যোগ শুরু হল। ইম্ফলের পথে আবার এগিয়ে চলল আজাদী বাহিনী।

ওদিকে রেঙ্গুন শহরে কী উৎসাহ উদ্দীপনা! তেইশে জানুয়ারী নেতাজীর জন্মোৎসব। জুবিলি হলে অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়েছে।

নিমেষে বিরাট হলটি ভরে গেল। ভরে গেল বাইরের বারান্দা, আশেপাশের সমস্ত জায়গা।

জড়ো হতে লাগল অসংখ্য উপহার, টাকা, সোনা আর রূপা। রেঙ্গুনের এক ব্যবসায়ী সংগ্রহ ক'রে নিয়ে এলেন কয়েক লক্ষ টাকা।

নেতাজী সবার দেওয়া ভক্তি ও ভালবাসার দান নিয়ে পরদিনই চলে এলেন যুদ্ধক্ষেত্রে।

নেতাজীর পূর্ব রণাঙ্গনে পৌঁছবার আগেই জাপানী বিমানবহর তৈরী হয়ে ছিল ভারতবর্ষের কয়েকটি বড় বড় শহরে বোমা ফেলবার জন্য। মিত্রপক্ষের মূল সরবরাহ ঘাঁটি কলকাতায়। সেখানে কয়েকবার বোমা ফেলল জাপানীরা।

নেতাজী জানেন ওদিকে কলকাতাকে বিব্রত রাখতে পারলেই ইংরেজ এদিকে ইম্ফলের দুর্গকে দুর্ভেদ্য করে রাখতে পারবে না। খসে যাবে তার হাতের বাঁধন। তাই জাপানের এই কাজে বিশেষ কোন আপত্তি করলেন না।

তবু নেতাজী চিন্তিত। আগেই যদি জাপানীরা ভারতবর্ষে ঢুকে পড়ে! ইংরেজ পালিয়ে গেলে জাপানীরা যদি সেখানে ঘাঁটি গেড়ে বসে, তাহলে সহজে কি তাকে হটানো যাবে?

সেজন্য সতর্ক হয়ে রইলেন নেতাজী।

ওদিকে শুরু হল জাপানের ভাগ্যবিপর্যয়।

ব্রিটিশের হাতে যখন মান্দালয়ের পতন হল তখন পরিষ্কার বোঝা গেল যে জাপানীরা ব্রিটিশ অগ্রসরকে আর বেশীদিন ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। তখন রেঙ্গুন ছেড়ে আসার পরিকল্পনা করা হল।

উনিশশো পঁয়তাল্লিশ সালের তেইশে এপ্রিল জাপানী প্রধান সেনাপতি রেঙ্গুন ত্যাগ করলেন। তাঁদের সঙ্গে একত্রে রেঙ্গুন ত্যাগ করতে সুভাষচন্দ্রের অস্থায়ী গভর্নমেণ্ট রাজী হল না।

রাজী না হওয়ার কারণ ছিল অনেক। রেঙ্গুনে আজাদ-হিন্দ্ ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দায় দায়িত্ব তার কম নয়। উনিশশো পঁয়তাল্লিশ সালের মে মাস পর্যন্ত এই ব্যাঙ্ক সমস্ত কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে চালিয়ে গেল। উনত্রিশে মে ব্রিটিশ সামরিক কর্তৃপক্ষ তা দখল করে বসল। দলে দলে আজাদ-হিন্দ্ সংঘের কর্মীরা ও তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা গ্রেফতার হতে লাগলেন।

এই সময়ে সর্বাধিনায়ক সুভাষচন্দ্র প্রচার করলেন—আজাদ-হিন্দ্ ফৌজের প্রতি তাঁর শেষ নির্দেশনামা ঃ

"আজাদ-হিন্দ্ ফৌজের অফিসার ও ভাইরা,

উনিশশো চুয়াল্লিশ সালের ফেব্রুয়ারী মাস থেকে আপনারা যেখানে বীরোচিত সংগ্রাম চালিয়েছেন এবং এখনও চালাচ্ছেন, আজ গভীর বেদনার সঙ্গে আমি সেই ব্রহ্মদেশ ছেড়ে যাচ্ছি। ইম্ফল ও ব্রহ্মদেশে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম চেস্টা ব্যর্থ হয়েছে কিন্তু আমাদের আরও অনেক চেস্টা করতে হবে।

আমি চির আশাবাদী। কোন অবস্থাতেই আমি পরাজয় মেনে নেব না। ইম্ফলের সমতল ভূমিতে, আরাকানের অরণ্য অঞ্চলে শত্রুদের বিরুদ্ধে বীরত্বের কাহিনী আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে চিরকাল লিখিত থাকবে। জয় হিন্দ্।"

ইম্ফল থেকে ফেরবার পথে আজাদী সৈন্যদের কতই না দুঃখকস্ট ভোগ করতে হল।

এক জায়গায় একটি সৈনিকের অবস্থা খুবই শোচনীয় হয়ে উঠল—বাঁচবার কোন আশাই আর নেই। ভাগ্যক্রমে তার দাদা সেখানে এসে উপস্থিত হল। ভাইয়ের অবস্থা দেখে সে কাঁদতে লাগল অঝোর ধারে।

সৈনিক ভাইটি বলল—"সে কি দাদা, তুমি আমার জন্য কাঁদছ!

নেতাজীর হাতে যে আমরা জীবন সঁপে দিয়েছি। এ জীবনের জন্য এত মায়া কেন ? আমার কাছে প্রতিশ্রুতি দাও, যতদিন বাঁচবে, ততদিন আমার অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করতে চেষ্টা করবে। মরবার সময় নেতাজী আমার কাছে নেই—তাই মনে বড় দুঃখ রইল।"

নেতাজীর প্রতি অসীম শ্রদ্ধা ও ভালবাসা সংঘের সমস্ত নরনারীর। আজাদ-হিন্দ্ ফৌজের অন্তর্গত ঝান্সীর রানী-বাহিনীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বয়োবৃদ্ধা ছিলেন চন্দ্রমুখী দেবী। তাঁর বয়স তখন ৫৪ বছর।

তিনি আজাদ-হিন্দ্ ফৌজে যোগ দিয়ে নার্সের কাজ নিয়েছিলেন। আজাদ-হিন্দ্ ফৌজের বিভিন্ন হাসপাতাল এবং সমরক্ষেত্রের কয়েকটি হাসপাতালেও কাজ করেছিলেন তিনি। ঝান্সীর রানী-বাহিনীতে তিনি ছিলেন সিপাহীর পদে। তাঁর তিনজন নাতি যোগ দিয়েছিল বালসেনা দলে।

নেতাজী এবং আজাদ-হিন্দ্ ফৌজের সকলেই তাঁকে 'মাতাজী' বলে সম্বোধন করতেন। ভারতে ফিরে পত্রিকার প্রতিনিধিদের কাছে তিনি বললেন এক চমকপ্রদ কাহিনী।

ব্রহ্ম রণাঙ্গনে তখন যুদ্ধের শেষ পর্যায়। রেঙ্গুনে মিয়ান হাসপাতালের উপর ব্রিটিশরা বোমা বর্ষণ করল। দুই বর্গমাইল জুড়ে চলল বোমার তাণ্ডবলীলা। ঐ হাসপাতালের কাছেই ছিল মাতাজীর বাসস্থান। শত শত নাগরিক এবং আজাদ-হিন্দ্ ফৌজের বহু সৈনিক তাতে আহত হল।

নেতাজী ছুটে এলেন আহতদের দেখবার জন্য। এই সময়ে মাথার ওপর দেখা দিল একদল বোমারু বিমান। তারা বোমাবর্ষণ শুরু করল। নেতাজীর গাড়িটি একটি বোমার আঘাতে নষ্ট হয়ে গেল। কিন্তু নেতাজী তাতে একটুও ভীত হলেন না। তিনি হেঁটেই ঐ হাসপাতালের দিকে এগিয়ে গেলেন।

নেতাজী সম্বন্ধে জানা গেল আরও কত কাহিনী। আজাদ-হিন্দ্ ফৌজ পরিচালনার জন্য তাঁর কত সাধ্য সাধনা—কত পরিশ্রম! চিন্তার বিরাম নেই—বিশ্রামের অবসর নেই।

বললেন তিনি—"যার প্রাণ আছে দেবার মতো, সে প্রাণ দাও; যার অর্থ আছে সে অর্থ দাও। সব দাও। যাও রিক্ত হয়ে।"

জনতার ঢেউ ওঠে নেতাজীকে ঘিরে।

ক্রোড়পতি, গরিব, দোকানদার, ডাক্তার, উকিল, কেরানী, গোয়ালা, ধোবা, নাপিত, কুলী, মজুর,—কেউ পিছিয়ে রইল না। নেতাজীর ঝুলি ভরে উঠল টাকায়। সোনায়, রুপায়।

রেঙ্গুনের হবিব দিলেন এক কোটি টাকা। আরও টাকা চাই। বিরাট আজাদ-হিন্দ্ বাহিনীর খরচ অজস্র—অপরিমেয়।

নেতাজীর গলার ফুলের মালা একদিন নিলামে তোলা হল। ডাক উঠল—এক হাজার—দু হাজার—দশ হাজার—পঞ্চাশ হাজার—এক লাখ।

শেষ পর্যন্ত দাম উঠল সাত-লাখ টাকা। কিনলেন এক পাঞ্জাবী ভদ্রলোক।

নেতাজী আশা করেছিলেন বর্ষার আগেই ইম্ফল দখল করা সম্ভব হবে। কিন্তু তা হল না। দ্বিতীয় অভিযান ব্যর্থ হওয়ার পর সব যেন গোলমাল হয়ে গেল।

অসহায় আজাদ-হিন্দ ফৌজ। সব পথ রুদ্ধ। একটি মাত্র পথ খোলা—মৃত্যুর পথ।

অসংখ্য আজাদী ফৌজ্ ঝাঁপিয়ে পড়ল মৃত্যুর বুকে। মৃত্যুর পর মৃত্যু। কিন্তু কি লাভ হবে এই অকারণ মৃত্যুতে?

নেতাজী হুকুম দিলেন—ফিরে চলো।

রেঙ্গুনের অদূরে শত্রু! কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ঢুকে পড়বে ওরা রেঙ্গুনে।

আজাদী ফৌজের হেডকোয়ার্টারে ছুটে আসেন ভোঁসলে, কিয়ানি আর আয়ার। বলেন—"নেতাজী, আপনি শীগগীর রেঙ্গুন ছেড়ে চলে যান। শত্রুরা আপনাকে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলবে।"

নেতাজী যাত্রার জন্য তৈরী হলেন। তাঁর সঙ্গে রানী-ফৌজ। ওদের তিনি ফেলে যাবেন না। সঙ্গে কয়েকজন সেনাপতি ও আজাদ-হিন্দ্ সরকারের মন্ত্রীরা।

বিদায় বর্মা! বর্মা পড়ে রইল পেছনে।

এখন কোথায় যাবেন? আপাততঃ ব্যাঙ্কক। তারপর? সিঙ্গাপুর?

ব্যাঙ্ককে পৌঁছেই নেতাজী জার্মানীর আত্মসমর্পণের সংবাদ পেলেন। কয়েকদিন পরই খবর রটে গেল রাশিয়া জাপানকে আক্রমণ করেছে। জাপানের পরাজয় অনিবার্য ও আসন্ন।

চারদিক থেকে বিপদ ঘনিয়ে আসছে। ঘন ঘন খবর আসছে সিঙ্গাপুর হেড কোয়ার্টার থেকে। সেখানে অবিলম্বে নেতাজীর যাওয়া দরকার।

নেতাজী সিঙ্গাপুর রওনা হয়ে গেলেন। সঙ্গে সমশের সিং, মেজর জেনারেল আলাগপ্পান, কর্নেল নাগার, কর্নেল গিয়ানি, সত্য সহায়।

সিঙ্গাপুরে পৌঁছেই কর্নেল হবিবুর রহমানকে ডেকে পরামর্শ-সভা শুরু হল।

মিত্রপক্ষ বেতারে ঘোষণা করেছে—জাপান করেছে আত্মসমর্পণ।

যদি তা সত্য হয় তাহলে উপায়?

আজাদ-হিন্দ্ সরকারের মন্ত্রিসভা সিদ্ধান্তে এসে গেল—নেতাজীকে শত্রুর হাতে বন্দী হতে দেওয়া হবে না।

সিঙ্গাপুর ছেড়ে যাওয়ার আগে নেতাজী গিয়ানিকে বললেন—"তোমার উপর সিঙ্গাপুর আর আজাদ-হিন্দ্-এর সব দায়িত্ব রইল। তোমাকে সাহায্য করবেন সরকার আর আলাগাপ্পান।

কোথায় যাচ্ছেন নেতাজী? মস্কো? মাঞ্চুরিয়া? না টোকিও?

সব দিকে যেন অন্ধকার।

জাপানের আত্মসমর্পণের ফলে আজাদ-হিন্দ্ ফৌজকেও আত্মসমর্পণ করতে হল। ভারতে নিয়ে আসা হল বন্দী সমর-নায়কদের। শুরু হল বিচার।

উনিশশো পঁয়তাল্লিশ সালের পাঁচই নভেম্বর শুরু হয় আজাদ-হিন্দ্ ফৌজের প্রথম তিনজন সমর-নায়কের বিচার। তাঁরা হলেন ক্যাপ্টেন শা নওয়াজ, ক্যাপ্টেন সাইগল ও ক্যাপ্টেন ধীলন।

সারা ভারতে তখন সে কী উত্তেজনা—সে কী আলোড়ন!

সরকার পক্ষে মামলা পরিচলনা করলেন অ্যাডভোকেট জেনারেল আর. এন. পি. ইঞ্জিনিয়ার ও মেজর ওয়ালস। স্যার তেজবাহাদুর সপ্রু ও ভুলাভাই দেশাই অভিযুক্তদের পক্ষসমর্থন করলেন।

লাল কেল্লায় শুরু হল সেই ঐতিহাসিক বিচার।

ক্যাপ্টেন শা নওয়াজ, ক্যাপ্টেন সাইগল ও ক্যাপ্টেন ধীলন সামরিক আদালতে সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার অভিযোগে অভিযুক্ত হলেন। তার উপর তাঁদের বিরুদ্ধে নরহত্যায় সহায়তা করবার অভিযোগও আনা হল।

বিচারে সামরিক আদালত তিনজনকেই যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত করলেন। তাঁদের চাকরি থেকে বরখাস্ত করবার এবং তাঁদের প্রাপ্য বেতন ও ভাতা বাজেয়াপ্ত করবার আদেশ দেওয়া হল।

এখন এই দণ্ড কার্যকরী করতে হলে কমাণ্ডার-ইন্-চীফের অনুমোদন দরকার। তাই তাঁর অনুমোদন চেয়ে পাঠানো হল।

কিন্তু কমাণ্ডার-ইন্-চীফ দেখলেন ভারতের আবহাওয়া খারাপ। সারা ভারতের লোক উত্তেজিত। তাই যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের দণ্ড মার্জনা করলেন। তাঁদের শুধু চাকরি থেকে বরখাস্ত ও ভাতা বাজেয়াপ্ত করার আদেশই বহাল রইল।

এর পরে হল ক্যাপ্টেন রসিদ আলির বিচার। বিচারে তাঁর

প্রতি সাত বছর কারাদণ্ডের আদেশ হল। এই আদেশ দেশবাসী শান্তচিত্তে মেনে নিল না। শুরু হল সারা দেশে বিক্ষোভ।

আজাদ-হিন্দ্ বাহিনীর ঘটনাবলীকে কেন্দ্র করে সারা ভারতে যেন এক নূতন যুগের সূচনা হল। দিকে দিকে বেজে উঠল মিলনের সুর। ধ্বনি উঠল মিলিত কণ্ঠে "জয় হিন্দ্"।

নেতাজীর বুকের রক্ত দিয়ে গড়া আজাদ-হিন্দ্ বাহিনী।

ভারতে সেই বাহিনী এল বিজয়ীরূপে নয়—বন্দীরূপে।

তবু ভারতবাসীর চোখে তারা বিজয়ী—তারা রূপকথার নায়ক। আবাল বৃদ্ধ বনিতার কাছ থেকে তারা পেল বিপুল সংবর্ধনা।

এই আজাদ-হিন্দ্ বাহিনীকে পেছনে ফেলে রেখে সিঙ্গাপুর থেকে চলে আসার সময় চোখে জল এসেছিল নেতাজীর।

ঝাঁন্সীর রানী বাহিনীর প্রায় পাঁচশো মেয়ে। নেতাজীর দুশ্চিন্তা ওদের জন্যই বেশি। ওদের মান ইজ্জৎ কি রক্ষা পাবে ইংরেজের হাতে ?

ডেকে পাঠান ক্যাপটেন মিসেস থেবরকে, নির্দেশ দেন, "প্রতিটি মেয়েকে যার যার ঘরে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করে দিন। প্রত্যেক মেয়ের সঙ্গে দিয়ে দিন বেশি করে টাকা।"

একদল ছেলের কথা ভেবে আকুল হয়ে ওঠেন নেতাজী। জাপানে ওদের পাঠানো হয়েছে সামরিক শিক্ষার জন্য। ওরা কি করবে ? কে দেখবে ওদের !

মনে পড়ে রেঙ্গুনের একটি দিনের কথা।

বিপ্লবী বীর যতীন দাসের স্মৃতি দিবস ও যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত আজাদ সৈন্যদের উদ্দেশ্যে শহীদ দিবস পালন করবার নির্দেশ দিয়েছিলেন নেতাজী।

তেজোদৃপ্ত ভাষণে তিনি বলেছিলেন—"মাতৃভূমি স্বাধীনতা চায়। কিন্তু স্বাধীনতার বেদীমূলে অসীম ত্যাগের প্রয়োজন। অতীতের বিপ্লবীদের ন্যায় তোমাদের আরাম, সুখ, অর্থ, সম্পদ, এমনকি সর্বস্ব ত্যাগ করতে প্রস্তুত থাকতে হবে। তোমরা তোমাদের সন্তানদের স্বাধীনতার জন্য উৎসর্গ করেছ, কিন্তু স্বাধীনতার দেবী তাতেই কেবল সন্তুষ্ট নন। তিনি কিসে সন্তুষ্ট হবেন তার গোপন রহস্য আজ তোমাদের কাছে উদ্‌ঘাটন করব। আজ তিনি ফৌজের জন্য কেবল সৈনিকই চান না। তিনি চান বিপ্লবী নারী ও পুরুষ—যারা আত্মঘাতী বাহিনীতে যোগদান করবে—যাদের মৃত্যু সুনিশ্চিত, এমন বিদ্রোহী চান যারা নিজেদের রক্তস্রোতে শত্রুকে নিমজ্জিত করবে।

'তুম হমকো খুন দো,
ম্যায় তুমকো আজাদী দুঙ্গা—'

'তোমরা আমাদের বুকের রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব।"

নেতাজীর আবেদন সমাপ্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে জনতার মধ্য থেকে সেই আবেদনের বিপুল সাড়া এসেছিল। সকলে একবাক্যে বলে উঠেছিল, "আমরা আমাদের রক্তদানে প্রস্তুত আছি।"

বহু বালক-বালিকা, তরুণ-তরুণী এগিয়ে এসেছিল তাদের মৃত্যু পরোয়ানায় সই করতে।

নেতাজী গম্ভীর কণ্ঠে বলেছিলেন—"নিজের মৃত্যু পরোয়ানা কালি দিয়ে সই করা চলে না, রক্ত দিয়ে সই করতে হয়।"

হাজার হাজার লোক নিজেদের দেহের রক্ত দিয়ে বালসেনা

বাহিনী ও আত্মঘাতী বাহাদুর শা বাহিনীতে নাম সই করেছিল সেদিন। কি অপূর্ব সেই দৃশ্য!

নেতাজী রেঙ্গুন পরিত্যাগ করে অন্যান্য সেনাদের সঙ্গে পায়ে হেঁটে এসেছিলেন সিঙ্গাপুরে। সৈন্যদের ছেড়ে এই বিপদের দিনে তিনি বিমানে আসতে রাজী হন নি। সিঙ্গাপুরে এসে বাস করছিলেন তিনি মায়ার নামে এক ইহুদীর বাড়িতে।

সেদিন ছিল উনিশশো পঁয়তাল্লিশ সালের পনেরোই আগস্ট। রাত নটা। নেতাজী গিয়ে ঢুকলেন ক্যাথে বিল্ডিংএ। এখানেই ছিল স্বাধীন ভারতীয় বেতারকেন্দ্র।

জাপানী অফিসার বাধা দিলেন। দেখতে চাইলেন সুভাষচন্দ্রের পাণ্ডুলিপি। কিন্তু নেতাজী তাঁকে অগ্রাহ্য করে ষ্টুডিওর মধ্যে ঢুকে গেলেন।

মালয়, শ্যাম, ইন্দোচীন, জাভা, সুমাত্রা, বোর্ণিও, ফিলিপাইন, জাপান, এশিয়া ও পৃথিবীর সর্বত্র যে ভারতবাসী রয়েছে তাদের উদ্দেশ্যে প্রচার করলেন তাঁর শেষ বাণী।

এই বক্তৃতাই তাঁর টোকিও যাত্রার পূর্ব পর্যন্ত শেষ বেতার ভাষণ।

সতেরোই আগস্ট নেতাজী ব্যাঙ্ককে এসে পৌঁছলেন। পরিদর্শন করলেন আজাদ-হিন্দ্ সংঘের শিবির। নেতাজীর তিনশো সংরক্ষিত সৈন্য একবাক্যে বলে উঠল—"জাপানীরা আত্মসমর্পণ করেছে, আমরা করিনি।"

নেতাজী সৈন্যদের দৃঢ়তার মনোভাব লক্ষ্য করে নিজে তাদের আত্মসমর্পণের কথা বলতে কুণ্ঠিত হলেন। তিনি ধীরে শুধু ধীরে বললেন—"হ্যাঁ, তোমরা ঠিক বলেছ, আমরা আত্মসমর্পণ করিনি।"

পরের দিন ব্যাঙ্কক থেকে যাবার সময় মেঃ জেনারেল ভোঁসলের কাছে নেতাজী রেখে গেলেন আত্মসমর্পণের নির্দেশ।

শেষের দিন যখন ঘনিয়ে এল—জাপানীরা হটে গেল; তখনও স্বাধীন ভারতীয় ফৌজ—I. N. A. আত্মসমর্পণ করেনি। হটতে চায় নি। খাদ্য নেই, পোশাক নেই, ওষুধ নেই, তবু এগিয়ে যাবার দুর্বার তাদের আকাঙ্ক্ষা।

স্বাধীন ভারতের বুকের ওপর স্বাধীনতার পতাকা উড়িয়েছিল তারা—স্বাধীনতার স্বাদ উপভোগ করেছে তারা মৃত্যুর মধ্যে, বেদনার মধ্যে। সেনাপতির আত্মসমর্পণের আদেশও গ্রাহ্য করতে চায় না তারা। তারা আত্মসমর্পণ করবে না। নেতাজীকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তা পালন করবে।

শেষ পর্যন্ত নেতাজীর নিজের হাতের স্বাক্ষর করা আদেশ-নামা তাদের দেওয়া হল।

নেতাজীর এ কী নিদারুণ আদেশ!

কেঁদে উঠল বীর যোদ্ধার দল।

জাপান সকরারের সঙ্গে পরামর্শের জন্য নেতাজী তখন যাত্রা করেছেন টোকিওর দিকে।

॥ ২১ ॥

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের খবর জানবার জন্য সারা ভারতের মানুষ ব্যাকুল।

কিন্তু হঠাৎ পাওয়া গেল কি নিদারুণ দুঃসংবাদ!

উনিশশো পঁয়তাল্লিশ সালের তেইশে আগস্ট জাপানী নিউজ এজেন্সী প্রচার করল—সুভাষচন্দ্র বিমান দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন।

কি ভাবে মৃত্যু হল নেতাজীর?

নিউজ এজেন্সী জানাল বিমানযোগে নেতাজী যাচ্ছিলেন টোকিওর দিকে। ১৮ই আগস্ট বেলা দুটোর সময় তাই-হোকু বিমানক্ষেত্রের কাছে সেই বিমানটি এক দুর্ঘটনায় পতিত হল। আগুন লেগে গেল বিমানে।

গুরুতর আহত অবস্থায় নেতাজীকে নিয়ে যাওয়া হল এক জাপানী হাসপাতালে। সেখানেই মধ্যরাত্রে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

লেফ্‌টেনাণ্ট সুনামাসা ছিলেন নেতাজীর সঙ্গে সেই বিমানে। তিনি তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হলেন। আজাদ-হিন্দ্ ফৌজের কর্নেল হবিবুর রহমানও সেই বিমানে ছিলেন। তিনি আহত হয়েছিলেন, তবে গিয়েছিলেন প্রাণে বেঁচে।

কিন্তু সব কথা কি সত্য?

নেতাজীর শেষ বিমান যাত্রা সম্বন্ধে পরে পাওয়া গেল আরও অনেক খবর।

প্লেন সাইগনে পৌঁছাল সকাল দশটায়। সেদিন ছিল সতেরোই আগস্ট। দুখানা প্লেন ছেড়েছিল ব্যাঙ্কক থেকে। একখানায় নেতাজী, কর্নেল হবিবুর রহমান, প্রীতম সিং, আয়ার এবং একজন জাপানী

অফিসার। অন্যখানায় গুলজারা সিং, আবিদ হাসান, দেবনাথ দাস এবং অন্য দুজন জাপানী।

সবাই মোটরে চেপে শহর থেকে একটু দূরে নারায়ণ দাসের বাড়িতে উপস্থিত হলেন। নারায়ণ দাস ছিলেন আজাদ-হিন্দ সংঘের হাউসিং বিভাগের সেক্রেটারী।

সাইগন শহর নিস্তব্ধ। রাজপথে লোকজন নেই। দুদিন আগে জাপানের আত্মসমর্পণের খবর বেরিয়েছে। তাই অজ্ঞাত আশঙ্কায় সবাই দিশেহারা।

নেতাজীর আগমনের সংবাদ কেউ জানল না। অবশ্য জানবার প্রয়োজন ফুরিয়ে গিয়েছিল। বিমানক্ষেত্রে এসেছিলেন শুধু আজাদ-হিন্দ্ সংঘের একজন কর্মী।

দাড়ি কামিয়ে নেতাজী স্নান করলেন। আহার করে একটু বিশ্রাম নেবার জন্য বিছানায় গা এলিয়ে দিলেন।

আধ ঘণ্টাও কাটল না। ছুটে এলেন একজন জাপানী অফিসার। বললেন—"একখানা জাপানী প্লেন এই মাত্র ছাড়বে। প্লেনে জায়গা আছে মাত্র একটি। আপনি কি যাবেন?"

নেতাজী উঠে বসলেন বিছানায়। জিজ্ঞেস করলেন—"এ প্লেন যাবে কোথায়?"

"জানি না।" অফিসার বললেন।

ঠিক সেই সময়ে এসে হাজির হল একখানা মোটর-গাড়ি। গাড়ি থেকে নামলেন জাপানী সংযোগমন্ত্রী আইসোদা হাচাইয়া আর ফিল্ড মার্শাল তেরোচির একজন স্টাফ অফিসার। ঘরে ঢুকে ওঁরা দরজা বন্ধ করে দিলেন। থাকলেন নেতাজীর কাছে শুধু হবিব।

ঘর থেকে নেতাজী বের হলেন প্রায় মিনিট দশেক বাদে। হবিব, আয়ার, আবিদ আর দেবনাথকে নিয়ে পাশের ঘরে ঢুকলেন। বললেন—"শোনো, একখানা প্লেন মাত্র পাওয়া গেছে। তাও

মাত্র একজনের জন্য পাওয়া যাবে সিট। আমার যাওয়া যদি তোমরা সাব্যস্ত কর আমাকে যেতে হবে একা। কি বলো তোমরা ?”

সারা কক্ষ তখন স্তব্ধ হয়ে গেল। সবাই ভাবতে লাগলেন, অন্ততঃ বারো জন যেতে পারবে একটা বম্বার প্লেনে! সে অবস্থায় আমাদের একজনকেও জাপানীরা নিতে চায় না কেন ? কি তাদের অভিপ্রায় ?

কিন্তু মুখ ফুটে কেউ কিছু বলতে পারলেন না।

নেতাজী বললেন—“দেরি করো না! সময় নেই মোটে। আমি যাবো কি না যাবো এই কথাটাই তোমরা শুধু বলো।”

কিন্তু নেতাজী সাইগনেই থাকুন এমন কথাই বা কে বলবে সাহস করে। যে কোন মুহূর্তে শত্রু এসে পড়বে এখানে। নেতাজীকে ওরা দাঁতে ছিঁড়ে ফেলবে টুকরো টুকরো করে। তাঁরা কয়েকজন পাশে আছেন সত্য। তাঁরা মরবেন, একথাও ঠিক। কিন্তু নিজেরা মরেও কি নেতাজীকে বাঁচাতে পারবেন।

একজন ওঁদের ভেতর থেকে এগিয়ে এলেন। বললেন—“স্যার, ওদের কাছে আরো জোর দিয়ে বলুন অন্ততঃ একজনের জায়গা ওরা করে দিক। যদি তা না-ই দেয়—” রুদ্ধ হয়ে এল কণ্ঠস্বর।

তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন— “আপনি চলে যান স্যার।”

এগিয়ে এসে আর একজন বললেন কাঁপা গলায়—“যেখানেই যাবেন, আমাদের তাড়াতাড়ি নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করবেন।”

কিন্তু কোথায় যাবেন নেতাজী ? একবারও স্পষ্ট করে সে কথাটি বললেন না। পরে জানা গেল প্লেন যাবে মাঞ্চুরিয়ায়। তারপর! তারপর আর কিন্তু জানা নেই।

জাপানী অফিসাররা দাঁড়িয়ে আছেন। এগিয়ে গেলেন নেতাজী। সঙ্গে সঙ্গে আবার পিছিয়ে এসে বললেন—“আর একটা সিট পাওয়া গেল। হবিব যাবে আমার সঙ্গে। এসো হবিব।”

হবিব এগিয়ে যেতেই অন্যান্যদের দিকে তাকিয়ে নেতাজী বললেন —"তোমরাও এসো আমার সঙ্গে। কী জানি, যদিই বা আরো সিট পাওয়া যায়।"

তখন অপরাহ্ন। সূর্য হেলে পড়ছে আকাশে।

নেতাজী উঠে গেলেন প্লেনে। সঙ্গে গেলেন হবিব।

আর সিট পাওয়া গেল না।

নেতাজীর কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে এল—"জয় হিন্দ্।"

সহকর্মীরাও প্রতিধ্বনি করলেন—"জয় হিন্দ্।"

বিমান উড়ে চলল আকাশে।

সিঁড়ি দিয়ে উঠবার সময় নেতাজী বলে গেলেন—"আবার দেখা হবে।"

কিন্তু আর দেখা হল না। ফিরে এলেন না নেতাজী।

আজও তাঁর প্রতীক্ষায় মানুষ তাকিয়ে আছে—"হে বীর, তুমি কবে আসবে ?"

কবে ফিরবেন নেতাজী !

শেষ